Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেক্যুলারিজম না শরীয়াহ কোনটা উত্তম কেন উত্তম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Sabikunnahar

রোলঃ 227020499

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেক্যুলারিজম না শরীয়াহ কোনটা উত্তম কেন উত্তম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Sabikunnahar

রোলঃ 227020499

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সেকুল্যারিজম না শরীয়াহ কোনটা উত্তম কেন উত্তম " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে Sabikunnahar, আইডিঃ 227020499 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সেক্যুলারিজম না শরীয়াহ কোনটা উত্তম কেন উত্তম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

Sabikunnahar

আইডিঃ 227020499

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

সেক্যুলারিজম কী?.....5

সেক্যুলারিজমের উৎপত্তি.....7

সেক্যুলারিজমের উৎপত্তির মূল কারণ.....9

সেক্যুলারিজমের নীতিমালা ও বৈশিষ্ট্য.....10

সেক্যুলারিজমের বিভিন্ন রূপ.....10

মুসলিমবিশ্বে এবং বাংলাদেশে সেক্যুলারিজম.....13

সেক্যুলারিজম ধর্মনিরপেক্ষ?.....18

সেক্যুলারিজম সমাজব্যবস্থার স্বরুপ.....19

ইসলামের দৃষ্টিতে সেক্যুলারিজম.....21

ইসলাম ও সেক্যুলারিজমের সংঘর্ষের প্রধান দিকসমূহ.....22

'লাকুম দ্বীনকুম ওলিয়াদ্বীন'.....23

'একজন ধার্মিক লোক কি ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) হতে পারে?.....26

সেক্যুলারিজমের কুফল.....28

ইসলামি শরীয়াহ.....31

ইসলামী শরীয়াহর উৎসসমূহ.....32

ইসলামী শরীয়াহর বৈশিষ্ট্য.....36

সেক্যুলারিজম না শরীয়াহ উত্তম?:.....40

ইসলামী শরীয়াহ কেন উত্তম:.....41

সেক্যুলারিজম কী?

সেক্যুলারিজমের তিনটি বাংলা অনুবাদ হতে পারে। যথা :

১. ইহজাগতিকতাবাদ

২. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

৩. ধর্মহীনতা বা ধর্মহীন মতবাদ।

১. 'ইহজাগতিকতাবাদ' এটাই সেক্যুলারিজমের সঠিক অনুবাদ। Secularism ল্যাটিন শব্দ Saculum শব্দ থেকে উদ্ভব হয়েছে। Saeculum শব্দের অর্থ ইহজগৎ। এ মতবাদের সমস্ত চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপ ইহজগৎকেন্দ্রিক। সুতরাং Secularism এর সঠিক অনুবাদ হবে ইহজাগতিকতাবাদ।

২. 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' এটি Secularism এর সঠিক বাংলা অনুবাদ নয়। তবে সমাজে এ অনুবাদ প্রচলিত হয়ে গেছে। ধর্ম ইহজগৎ ও পরজগৎ উভয় জগৎকে স্বীকার করে। কিন্তু সেক্যুলারিজম কেবলমাত্র ইহজগৎ স্বীকার করে আর পরজগতকে অস্বীকার করে। আর 'নিরপেক্ষ' শব্দের অর্থ কোনও পক্ষে নয়। কাজেই 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দের অর্থ কোন ধর্মের পক্ষে নয়। অর্থাৎ সমস্ত ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন। বাংলা একাডেমির ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে রয়েছে, "ধর্মনিরপেক্ষ: ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এমন; secular।"

ধর্মনিরপেক্ষ শব্দের মধ্যে 'নির' প্রত্যয় যোগ করা হয়েছে। 'নির' এর অর্থ 'নেই' অর্থাৎ ধর্মের পক্ষে নেই। অথবা ধর্মের 'অপেক্ষা' নেই যার। বাংলা একাডেমির অভিধানে 'অপেক্ষার' এক অর্থ করা হয়েছে ভরসা/নির্ভরতা অর্থাৎ যার ধর্মের উপর ভরসা বা নির্ভরতা নেই, সেই হলো ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি।

সুতরাং যে ব্যক্তি চিন্তা-চেতনায়, ধ্যান-ধারণায়, কার্যকলাপে ও জীবনের সব ক্ষেত্রে ধর্মের পক্ষে অবস্থান করল, সে হলো ধর্মের পক্ষের লোক। আর যে ব্যক্তি এমন হবে না, সে হলো ধর্মনিরপেক্ষ।

৩. ধর্মহীনতা বা ধর্মহীন মতবাদ

যেহেতু এ মতবাদের লোক সব ক্ষেত্রে ধর্মের পক্ষের নয় বা ধর্মের উপর ভরসা নেই কিংবা সমস্ত ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন। তাই এ মতবাদ হলো ধর্মহীন মতবাদ।

এজন্যই সেক্যুলারিজমের আরবি 'আলমানিয়্যাহ' শব্দের অনুবাদ করা হয় 'লা-দীনিয়্যাহ' অর্থাৎ ধর্মহীনতা।

আরবিতে সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে,

فصل الدين عن الدولة والحياة.

অর্থাৎ ধর্মকে জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। মূলত এর অর্থ ধর্মপালনের স্বাধীনতা নয়, বরং ধর্মহীনতা।

উইকিপিডিয়াতে সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে,
"ধর্মনিরপেক্ষবাদ বলতে সাধারণত রাষ্ট্র আর ধর্মকে পৃথকরূপে প্রকাশ করাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে ধর্ম বা ধর্মীয় রীতিনীতির বাইরে থেকে পরিচালনা করাকে বোঝানো হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইন কোন নির্দিষ্ট ধর্মের উপর নির্ভরশীল থাকে না।... ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো, তথ্য এবং প্রমাণের উপর নির্ভর করবে, কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর নয়।"

অর্থাৎ রাষ্ট্র তার সিদ্ধান্ত নিবে যুক্তি, বাস্তবতা ও তথ্য-প্রমাণের উপর ভিত্তি করে। কোনো ধর্মবিশ্বাসের উপর নয়। অর্থাৎ আপনি ব্যক্তিজীবনে ধার্মিক, রাজনৈতিক জীবনে ধর্মহীন। আপনার ধর্ম কেবলই আপনার ব্যক্তিগত বিষয়ে সীমাবদ্ধ। আপনার ধর্মবিশ্বাসে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে ধর্মের উপস্থিতি না থাকতে হবে।

Oxford Dictionary তে Secularism এর সংজ্ঞা :

Secularism means the doctrine morality should be based solely on regard to the wellbeing of mankind in the present life, to exclusion of all consideration drawn from belief in God or in future life.

সেক্যুলারিজম এমন একটি মতবাদ, যে মতবাদে মানবজাতির ইহজগতের কল্যাণ চিন্তার উপর গড়ে উঠবে এমন এক নৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে থাকবে না কোনো ধরনের আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাসভিত্তিক বিবেচনা।

Encyclopedia বা বিশ্বকোষে Secularism এর নিম্নরূপ দুটো সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে
1. Secular spirit or tendency especially a system of political or social philosophy that reject all from of religious faith.

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ এমন একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন, যা সকল ধর্মবিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে।

2. The view that public education and other matters of civil society conducted without the introduction of Religious element.

সেক্যুলারিজম এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে সাধারণ শিক্ষা ও সামাজিক সংস্থা পরিচালনায় কোনো ধরনের ধর্মীয় উপাদান অন্তর্ভুক্ত হবে না।

chambers dictionary -এর মতে,

The belief that the state morals, education should be independent of religion.

"ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো এমন এক বিশ্বাস, যাতে রাষ্ট্র, নৈতিক, শিক্ষা ইত্যাদি সবকিছু ধর্মমুক্ত থাকবে।"

ক্যামব্রিজ ডিকশনারিতে এসেছে,

The belief that religion should not be involved with the ordinary social and political activities of a country.

"সেকুলারিজম এমন এক বিশ্বাস, ধর্ম দেশের সাধারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে জড়িত হওয়া উচিত নয়।" (ঈমান ও আকীদা বই)
উল্লিখিত সংজ্ঞার বিচারে সেক্যুলারিজমের দুটি দিক বেরিয়ে আসে।
১। ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা।
২। সব মতের প্রতি সমান ও নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করা।

সেক্যুলারিজমের উৎপত্তি

মধ্যযুগে ইউরোপে চার্চের ক্ষমতা সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত হয় এবং তার ফলে সম্রাট ও পোপের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। চার্চ কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে থাকে এবং সম্রাট ও চার্চের ওপর খবরদারি শুরু করে। চার্চ গ্রিক দর্শন থেকে এমন কতগুলো তত্ত্ব ও

বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল যাকে তারা 'পরম সত্য' বলে মনে করত এবং বিজ্ঞানের পরীক্ষায় তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হলেও তার বিরোধিতা করা ধর্ম বিরোধিতা বলে গণ্য করত। ধর্মযাজকদের এ গোঁড়ামির ফলে ইউরোপীয়দের বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস ও ধর্মযাজকদের প্রতি অবিশ্বাস প্রবল হতে থাকে। ধর্মযাজকের বাড়াবাড়ি এক সময় এমন পর্যায়ে পৌছে যে, পৃথিবী গোলাকার এ বক্তব্যের জন্য বিজ্ঞানীদের পুড়িয়ে মারা আরম্ভ হয়। জনসাধারণের দৃষ্টিতে এ সময় ধর্ম পরিণত হয় এমন একটা দানবে যার অত্যাচারে দিবারাত্র অতিষ্ঠিত হতে হয়। ধর্মের নামে এরূপ মিথ্যাচার, কুসংস্কার ও প্রতারণার প্রতিবাদে ইউরোপের বিবেকবান স্বাধীনচিত্ত মানুষ সোচ্চার হয়ে ওঠে। মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬) প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার আন্দোলনের (Protestant Reformation Movement) মাধ্যমে খ্রিস্ট ধর্মযাজকদের দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেন। পঞ্চদশ শতকে এ আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে ওঠে।
১৯ শতকের মাঝামাঝিতে এসে একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ মতবাদ হিসেবে সেক্যুলারিজমের অভ্যুদয় ঘটে। সেক্যুলারিজমের মূল প্রবক্তা ছিলেন ব্রিটেনের জর্জ জেকব হোলিয়ক (১৮১৭-১৯০৪)।

ইতালির ম্যাকিয়াভেলি রেনেসাঁর যুগে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্ম ও ধর্ম বিশ্বাসকে দূরে ঠেলে দেয়ার জন্য পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। তিনি এ অভিমত প্রকাশ করেন যে, রাষ্ট্রের নাগরিকগণ ইচ্ছা করলে ব্যক্তিগতভাবে কোন ধর্ম ও নৈতিকতা অনুসরণ করতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রকে তার উর্ধ্বে থাকতে হবে।ম্যাকিয়াভেলির এ দৃষ্টিভঙ্গিকেই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেক্যুলারিজম হিসেবে গ্রহণ করেছে।পশ্চিমা জগতে চার্চের প্রভাব ও হস্তক্ষেপমুক্ত শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেক্যুলার রাষ্ট্রদর্শন গড়ে ওঠে। মনে রাখা প্রয়োজন, চার্চ যে খ্রিস্ট ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে, সে খ্রিস্টধর্ম গোড়া থেকে কোন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় দর্শনের প্রবক্তা ছিল না। সে ধর্ম রাষ্ট্র পরিচালনার কোন নীতি, বিধি-বিধান প্রণয়ন করেনি।পরবর্তী শতকের প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লব এ নতুন বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করেছে যে, কোন অলৌকিক সাহায্য ছাড়াই বিশ্বে মানবজীবন পরিপূর্ণতা অর্জন করে।ফলে ধর্মীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়ে জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনার বিকাশ ঘটে এবং অনেকগুলো জাতি রাষ্ট্রের (Nation States) উদ্ভব হয়।

ইসলামের প্রথম যুগে রাষ্ট্র ছিল সার্বিকভাবে ইসলামভিত্তিক। আইন-কানুন, নীতিনিয়ম সবকিছুরই মূল উৎস ছিল কুরআন-সুন্নাহ। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্র ও ইসলামের বন্ধন দুর্বল হতে থাকে। তবুও অনেক বিচ্যুতি সত্ত্বেও আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি ছিল ইসলাম। কুরআন- সুন্নাহ ছিল আইনের মূল উৎস। স্বৈরাচারী নিপীড়ক শাসককেও তাদের শাসনের বৈধতার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রীয় ভিত্তিকে মেনে নিতে হতো। ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ ইসলামী খিলাফতের আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি পর্যন্ত কমবেশি এ অবস্থা বিরাজ করছিল। পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শাসনের বিস্তার ও অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের কারণে মুসলিম বিশ্বে সেক্যুলার ভাবধারার প্রসার

ঘটে।মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক (১৮৮১-১৯৩৮) এর নেতৃত্বে সেক্যুলার তুর্কি রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্বে আনুষ্ঠানিকভাবে সেক্যুলার রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। আর পরবর্তী দশকগুলোতে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেক্যুলার রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

সেক্যুলারিজমের উৎপত্তির মূল কারণ

১. দ্বন্দ্ব নিরসন:সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা বেশি দিন আগের পরিভাষা নয়। ফরাসী বিপ্লবের পরের। বিপ্লবটা ১৮০০ এর কাছাকাছি সময়ের। ইউরোপে গির্জার পাদ্রীদের মনগড়া মতামতের সাথে যখন বৈজ্ঞানিকদের সাথে দ্বন্দ্ব দেখা দিল এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে পাদ্রীদের প্রভাব থাকার কারণে বৈজ্ঞানিকদের উপর অনেক বছরব্যাপী গির্জায়ী নির্যাতন ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম পরিচালিত হল, তখন এ প্রস্তাব গৃহীত হল যে, ধর্ম গির্জা ও মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকুক আর সমাজ ও পার্থিব জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব রাষ্ট্রের ওপর ন্যাস্ত থাকুক।তাদের বাই*বেলে উল্লেখ করা হয়েছে,

Give to the emperor the things that are the emperor's, and to God the things that are God's.‘যা সম্রাটের তা সম্রাটকে দাও, আর যা ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দাও। (বাইবেল- নতুন নিয়ম; মথি লিখিত সুসমাচার ২২: ২১।)

এখান থেকে সেক্যুলারিজম মতবাদের যাত্রা শুরু হয়। এরপর থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে পাদ্রীদের প্রভাব শেষ হয়ে যায় । ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন ধর্ম থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে।কাজেই সেক্যুলারিজম মতবাদটি মূলত গির্জায়ী নির্যাতনের প্রতিরোধে পাদ্রী ও বৈজ্ঞানিকদের মাঝে সংকট ও দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দ্বন্দ্ব নিরসনে পশ্চিমা বিশ্বে উৎপত্তি লাভ করে করেছে। ফলে তারা ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দ্বন্দ্ব নিরসন করেছে। কিন্তু মুসলমানদের মাঝে এমন কোন সংকট দেখা দেয়নি। ফলে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রশ্নই আসে না।

২. তাদের ধর্ম তথা খৃস্টবাদ অপূর্ণাঙ্গ, পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা নয়। ফলে রাষ্ট্র পরিচালনা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যান্য তন্ত্রমন্ত্রের সহায়তা নিতে হয়। আর এতে তাদের ধর্মের স্বকীয়তা, নিজস্ব রীতিনীতি হারানোর কিছু নেই।কিন্তু ইসলাম পূর্ণাঙ্গ, পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। তাই ইসলাম যদি সেক্যুলারিজমকে মেনে নেয়, তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্র সহ জীবনের অসংখ্য ক্ষেত্রে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবালি, ধর্মের স্বকীয়তা ও নিজস্ব রীতিনীতি হারাতে হয়। এবং তদস্থলে অন্য তন্ত্রমন্ত্রকে বিধানদাতা হিসেবে মেনে নিয়ে আল্লাহর সাথে শিরক করতে হয়।

সেক্যুলারিজমের নীতিমালা ও বৈশিষ্ট্য

সেক্যুলারিজমের কতিপয় নীতি ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রধান প্রধান নীতি ও বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১.সেক্যুলারিজমের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে কেবল বস্তুগত উপায়ে মানবসমাজের উন্নতির প্রচেষ্টা চালানো। মানবকল্যাণে শুধু বস্তুগত উপায়-উপকরণই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ-এক্ষেত্রে কোন অদৃশ্য শক্তির বা স্রষ্টার কোন ভূমিকা নেই এবং স্রষ্টার সাহায্যেরও কোন প্রয়োজন নেই।ইহজাগতিক বা পার্থিব জীবন পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে ধর্মের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করা হয়।

২. রাষ্ট্র বা রাজনীতির সাথে ধর্ম সংযুক্ত থাকবে না। রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে। ধর্ম থাকবে ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে। এটি ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার। ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনায় কোনভাবেই ধর্মকে বিবেচনা করা যাবে না।

৩.নৈতিকতার ভিত্তি ধর্ম বিশ্বাস নয় বরং যুক্তিবুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল।নৈতকতার মাপকাঠি হয় মানবীয় খেয়াল খুশি।

৪.মানুষের আচরণ ও সমাজের কল্যাণের জন্য যে নীতিমালা ও আইন-কানুনের প্রয়োজন তা একমাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে রচনা করা সম্ভব। এর জন্য কোন ধর্মবিশ্বাস, নবী-রাসূল, প্রত্যাদেশ ইত্যাদির প্রয়োজন নেই।

৫.সংখ্যাগুরুর মত কে ভালো মন্দ নির্ধারণের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহন করা

৬.সকল মতের প্রতি উদার ও নিরপেক্ষ অবস্থা গ্রহণ করা।

সেক্যুলারিজমের বিভিন্ন রূপ

সেক্যুলারিজম ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক একটি মতবাদ। এর কারণ হচ্ছে ইসলাম ত্যাগ করার কারণে যেসব মুসলমান ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় তন্মধ্যে অন্যতম হলো এ কথা বিশ্বাস করা যে, রাসূল (সা) এর শাসননীতির চেয়ে অন্য নীতি উত্তম এবং রাসূল (সা) এর পেশকৃত হিদায়াতের চেয়ে অন্য ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ। স্বতন্ত্র মতবাদ হিসেবে সেক্যুলারিজমের একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে শুরু হলেও বর্তমানে বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে এর অনুশীলন হচ্ছে।

তত্ত্বগতভাবেও এ মতবাদকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এর বিভিন্ন ধরনের মধ্যে প্রধানত চারটি ধরনই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

১.উদারনৈতিক সেক্যুলারিজম: উদারনৈতিক সেক্যুলারিজম ধর্মের প্রতি উপেক্ষার নীতি গ্রহণ করে। ধর্মের ব্যাপারে এ মতবাদ প্রকাশ্যভাবে মারমুখো নয়। ব্যক্তির নিজস্ব পরিমণ্ডলে ধর্মের অনুশীলন উদারনৈতিক সেক্যুলারগন স্বীকার করে থাকেন। তাদের মূল আপত্তি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সাথে ধর্মের কোন প্রকার সম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারে। ব্যক্তিজীবনে কেউ ধার্মিক হলে তাতে আপত্তি করার তেমন কিছু নেই। ব্যক্তিগত জীবনে যে কোন ধর্মে বিশ্বাস ব্যক্তির অধিকারও বটে। তবে এ বিশ্বাস যাতে সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিফলিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখলেই চলবে। পাশ্চাত্য জগতের গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে এ ধরনের সেক্যুলারিজমের অস্তিত্ব রয়েছে।

২.চরমপন্থী বা মারমুখো সেক্যুলারিজম: যে সেক্যুলারিজম চিন্তাধারা ধর্মের বিরুদ্ধে চরমনীতি অবলম্বন করে থাকে তা-ই চরমপন্থী সেক্যুলারিজম। 'ধর্মই অনিষ্টের মূল, শোষণের হাতিয়ার, জনগণের জন্য আফিমস্বরূপ, তাই ধর্মকে শুধু সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে নয়, ব্যক্তির মন মগজ থেকেও উৎখাত করতে হবে।' চরমপন্থী সেক্যুলারিজমের ধর্মের প্রতি উল্লিখিত মারমুখো মনোভাবই পোষণ করে থাকে। সমাজতান্ত্রিক মতবাদ কমিউনিজমই প্রধানত এ ধরনের সেক্যুলারিজমের প্রবক্তা। তত্ত্বগতভাবেই ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াইকে এ মতবাদ ঐতিহাসিক দায়িত্ব মনে করে। ইদানীং অবশ্য কৌশলগত কারণে ধর্মের প্রতি প্রকাশ্য যুদ্ধংদেহী মনোভাব কিছুটা কমে এসেছে। তবে তত্ত্বগত অবস্থানের তেমন একটা পরিবর্তন হয়নি।

৩.সাম্প্রদায়িক সেক্যুলারিজম:বিশেষ কোন সম্প্রদায় বা কোন ধর্মের ভিত্তিতে সৃষ্ট সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও সুবিধার প্রতি অধিক মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করলেও যে ধর্মের ভিত্তিতে সম্প্রদায়টি গঠিত তার প্রতি মোটেই গুরুত্ব না দেয়াকে সাম্প্রদায়িক সেক্যুলারিজম বলা হয়। সাম্প্রদায়িক সেক্যুলারিজমের মূল কথা হলো সাম্প্রদায়িক স্বার্থ দেখা হবে ঠিকই কিন্তু যে ধর্মের ভিত্তিতে সম্প্রদায়টি গঠিত, সে ধর্মের ভিত্তিতে সম্প্রদায়টি পুনর্গঠন করতে প্রস্তুত না হওয়া। যেমন: ব্রিটিশ আমল থেকে আজ পর্যন্ত এদেশে এমন অনেকেই রয়েছেন যারা মুসলিমদের জন্য বিগলিত প্রাণ, মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রতি তাদের মাঝে রয়েছে প্রবল উৎসাহ। কিন্তু সমাজজীবনে ইসলামের প্রতিষ্ঠাকে তারা এড়িয়ে যান বা অস্বীকার করেন। এমনকি তাদের কেউ কেউ মুসলিমদের স্বার্থেই নাকি রাজনীতির সাথে পবিত্র ধর্মকে জড়িত করা উচিত হবে না- এ তত্ত্বও প্রচার করে থাকেন। তারা মূলত সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি দ্বারা আচ্ছন্ন। সাথে সাথে তারা সেক্যুলারিজমের সমার্থক। এ দু'য়ের অদ্ভুত সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে সাম্প্রদায়িক সেক্যুলারিজম ইহুদি সম্প্রদায়ের সেক্যুলারিজম এমনি আর একটি উদাহরণ।

৪.ছদ্মবেশী সেক্যুলারিজম:আর এক ধরনের সেক্যুলারিজমের অস্তিত্ব রয়েছে মুসলিম দেশগুলোতে, তা হচ্ছে ছদ্মবেশী সেক্যুলারিজম।এর তাৎপর্য হচ্ছে, প্রকাশ্যে সেক্যুলারিজমের কথা বলা হবে না, কিন্তু কাজে কর্মে সব বিষয়েই সেক্যুলারিজম প্রাধান্য লাভ করবে। শুধু কথা বা প্রচারের সময় ধর্মের নামটা ব্যবহার করা হবে। অথবা কোথাও কোথাও ধর্মের ছদ্মাবরণে সেক্যুলারিজমের শাসন চলবে। কারণ জনমতের ভয়ে ক্ষমতার স্বার্থে ক্ষমতাসীনরা ও রাজনীতিকগণ জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য এ ভণ্ডামির আশ্রয় নেন। তারা প্রকাশ্যে তাদের মনের কথা বলতে সাহস পান না। তাই ইসলামের নাম ব্যবহার করেন শুধু ধোঁকা দেয়ার জন্য। তারা ধর্মের ব্যবসা করেন, ধর্মের নাম ভাঙিয়ে রাজনীতি করেন।এরা কখনো সাম্প্রদায়িকতাকেও কাজে লাগায়।

মুসলিমবিশ্বে এবং বাংলাদেশে সেক্যুলারিজম

সেক্যুলারিজম প্রাচ্যদেশীয় মতবাদ নয়। এটা মানবমস্তিষ্কপ্রসূত সম্পূর্ণ একটি পাশ্চাত্য মতবাদ। ইউরোপের রেনেসাঁ যুগে এ মতবাদের জন্ম হয়। মুসলিম বিশ্বে এমন কিছু নেতা ছিলেন যারা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করতেন। তাদের একজন কামাল আতাতুর্ক। তিনি সর্বপ্রথম তুরস্কে সেকুলারিজম আমদানি করেন। তিনি তুরস্কের সেনাপ্রধান ছিলেন।১৯২২ সালে কামাল আতাতুর্ক উসমানী সালতানাতের পতন ঘটিয়ে তুরস্কের রাষ্ট্রপতির পদ দখল করেন।১৯২৩ সালের ২৯ অক্টোবর তিনি আইনের মাধ্যমে 'খিলাফতের' বিলুপ্তি ঘোষণা করে তুরস্ককে একটি সেকুলার রাষ্ট্রে পরিণত করেন। অথচ খোলাফায়ে রাশেদার যুগ থেকে মুসলিম বিশ্বে 'খিলাফত ব্যবস্থা' চালু ছিল। খলিফা ছিলেন সমগ্র মুসলিম বিশ্বের প্রধান।

বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর বলবৎ হয়।সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়:'জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার। আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।'৮ নং ধারার ১ নং উপধারায় লেখা হয়
'জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- এই নীতিসমূহ রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।'১৯৭২ সালের সংবিধান কার্যকর হবার পর বাংলাদেশ একটি সেক্যুলার রাষ্ট্রে পরিণত হয়।যারা বাংলাদেশকে সেকুলার রাষ্ট্র বানানোর প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের বক্তব্য মোটামুটি এরকম:
১.ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার- ধর্ম হলো Private relation between man and God.
২. ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার
৩. মানব ধর্ম আসল ধর্ম অন্যান্য ধর্ম সাম্প্রদায়িক
৪. ইসলাম সাম্প্রদায়িক ধর্ম
৫.ইসলাম ধর্ম পবিত্র ধর্ম। পবিত্র ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনা উচিত নয়।

১.ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার:প্রথমে ধর্মের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা হলো Private relation between man and God.অর্থাৎ ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের নাম হলো ধর্ম।এ সংজ্ঞার বাইরে আরো দুটি সংজ্ঞা আছে। একটি সংজ্ঞা জার্মান দার্শনিক ইহুদি সন্তান Karl Marks দিয়েছেন। এটি হলো Religion is the opium of the people. অর্থাৎ জনগণের নিকট ধর্ম আফিম সদৃশ। অন্য সংজ্ঞাটি প্রদান করেছেন ইহজাগতিকতাবাদী সেকুলার বস্তুবাদী দার্শনিকগণ। তাদের দেয়া সংজ্ঞা হলো- 'ধর্ম মানুষের অলীক কল্পনার ফসল।'
এ তিনটি সংজ্ঞাই ধর্মের সঠিক সংজ্ঞা নয়। ধর্ম মানুষের জন্য এসেছে কোনো মানুষ ধর্ম সৃষ্টি করেনি।

ধর্মের সঠিক সংজ্ঞা হলো- 'প্রত্যেক নবী রাসূলের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে ফেরেশতা সর্দার হযরত জিবরাঈল (আ.) এর মাধ্যমে মানুষের জন্য যে হেদায়াত বা জীবনযাপন প্রণালী এসেছে সে হেদায়াতের আরো একটি কুরআনি পরিভাষা হলো 'দ্বীন' যার বাংলা অনুবাদ আমাদের সমাজে প্রচলিত হয়ে গেছে 'ধর্ম' হিসেবে। 'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন রাসূল পেরণ করেছি (এ নির্দেশ দিয়ে যে) আল্লাহর বন্দেগি কর; তাগুত থেকে বিরত থাক।' (সূরা আন নহল, আয়াত-৩৬)।ধর্ম শুধু মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারের সাথে সম্পর্ক নয়, ধর্ম মানুষের জীবনের সার্বিক দিকের সাথে সম্পৃক্ত।

২.ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার

রাষ্ট্র তথা দেশ বলতে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, তার ভূ-গর্ভস্থ সম্পদ, জলজ সম্পদ, ভূপৃষ্ঠস্থ সম্পদ ও ভূ-উপরস্থ সম্পদ এবং সমুদ্রসীমা থাকলে উপকূলস্থ সম্পদ ইত্যাদি বুঝায়।

'আকাশরাজ্য ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর।' (সূরা বাকারা, আয়াত ২৮৪)

আকাশ রাজ্য ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তিনিই মালিক সেসব জিনিসের যা আসমান ও জমিনের আছে। আর যা আছে আসমান ও জমিনের মাঝখানে এবং মাটির গর্ভে। (সূরা ত্বাহা, আয়াত ৬)

'বল প্রতিটি জিনিসের সৃষ্টিকর্তা কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তিনি একক, তিনি সর্বজয়ী। (সূরা রা'দ, আয়াত ১৬)।

আল্লাহ মানবজাতিকে তাঁর খলিফা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। ।তিনি মানুষের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। 'তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন'। (সূরা : বাকারা, আয়াত ২৯)।সুতরাং জনগণ সবকিছুর মালিক নয়। তবে মানুষ হোক সে হিন্দু বা মুসলমান, বৌদ্ধ কিংবা খ্রিস্টান, সাদা বা কালো, নারী কিংবা পুরুষ সবই আল্লাহর খলিফা তাঁর প্রতিনিধি এবং সবকিছুর ভোগাধিকারী। আর মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর মালিকানাধীন সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছামতো ব্যবহার করবে।

ধর্ম যার যার এ কথা দ্বারা সেক্যুলাররা বুঝাতে চাচ্ছে- যারা ধর্ম পালন করতে চায়, তারা ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম পালন করুক তাতে কোনো আপত্তি নেই। তবে রাষ্ট্রে যেহেতু হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবার বসবাস (আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য) সুতরাং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারসমূহে যারা সেক্যুলার তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। তারা তাদের ইচ্ছা ও খেয়াল-খুশিমতো আইন প্রণয়ন করে সরকার চালাবে। ধার্মিক লোকেরা ব্যক্তিগত গণ্ডির সীমারেখার মধ্যে ধর্ম পালন করবে, এর বাইরে ধর্মের কোনো অবস্থান থাকবে না।ধর্মীয় আইন-কানুন কেবলমাত্র পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক, বিচার ফয়সালা ইত্যাদি বিষয়সমূহেও ধর্মীয় আইনের অস্তিত্ব বিদ্যমান। সব ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্র যেহেতু

সকল ধর্মকে স্বীকৃতি দেয়, অতএব রাষ্ট্রের পক্ষে সব ধর্মের সকল আইন-কানুনের স্বীকৃতি দিতে আপত্তি কোথায়?হ্যাঁ- হিন্দু ধর্মীয় আইন-কানুন কেবলমাত্র হিন্দুদের উপর প্রযোজ্য হবে। তেমনি ইসলামী আইন-কানুন শুধুমাত্র মুসলমানদের উপর প্রযোজ্য হবে, অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীদের উপর প্রয়োগ হবে না। একই কথা বৌদ্ধ-খ্রিস্টানদের উপর প্রযোজ্য।

ইতিহাসের শিক্ষা বড় শিক্ষা। মানব ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়ে শেষ নবী মানবতার মহানায়ক হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনা রাষ্ট্রে ৪৭ ধারাবিশিষ্ট 'মদিনা সনদ' রচনা করেন। 'মদিনা সনদই' মানবজাতির রাজনৈতিক ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান- Written Constitution. মদিনা রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক ইহুদিদের নেতৃবৃন্দ এ সনদে স্বাক্ষর করেন।এ রাষ্ট্রের কর্ণধার হযরত মুহাম্মদ (সা.) মুসলমানদের উপর ইসলামী আইন- কানুন ও বিধি-বিধান জারি করেন। ইহুদিদের উপর এ আইন-কানুন জারি করা হয়নি। অন্যদিকে ইহুদিদের উপর তাদের ধর্মীয় আইন-কানুন জারি করার জন্য তাদের নেতৃবৃন্দের উপর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। মদিনা ধর্মনিরপেক্ষ বা সেক্যুলার রাষ্ট্র ছিল না। মদিনা ছিল ধর্মের পক্ষের রাষ্ট্র। মদিনা রাষ্ট্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং ধর্ম বর্ণ, ভাষা, গোত্র, অঞ্চল নির্বিশেষে সকল মানুষ 'আল্লাহর খলিফা' এ মর্যাদায় মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

৩. মানব ধর্ম আসল ধর্ম অন্যান্য ধর্ম সাম্প্রদায়িক

উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলা যায়:মানব ধর্ম যদি আসল ধর্ম হয় তবে অনুসন্ধান করে জানতে হবে এ ধর্মের উপাদান কী কী?সবাই জানে ধর্মের অত্যাবশ্যক উপাদন হলো- স্রষ্টা, সৃষ্টি, নবী-রসুল, ধর্মগ্রন্থ,পুনরুত্থান, শেষ বিচার, স্বর্গ, নরক, পূজা-উপাসনা-ইবাদত, পূজারি, যার উদ্দেশ্যে পূজা প্রদান করা হয় (মাবুদ) ইত্যাদি। মানবধর্মে এ সমস্ত উপাদান আছে কি? যদি না থাকে তবে এটা ধর্ম পদবাচ্য হলো কবে? কার মাধ্যমে? কিভাবে?বলা হয় মানবধর্মের রচয়িতা মানুষ। সবাই জানে মানুষ যা রচনা করে তা মতবাদ (ism) হয়, ধর্ম হয় না। তারপরও যদি জোর খাটিয়ে বলা হয় মানবধর্ম আসল ধর্ম তাহলে কিছু প্রশ্নের সৃষ্টি হয় যার জবাব পাওয়া দরকার।

মানবধর্মের রচয়িতা-

কোন মানুষ?

কোন শ্রেণীর মানুষ?

কোন দেশের মানুষ?

কোন কালের মানুষ?

কোন বর্ণের মানুষ?

যিনি এ ধর্ম রচনা করেছেন- তিনি কি সবজান্তা?
তিনি কি ভুলের ঊর্ধ্বে?
তিনি কি স্বার্থের ঊর্ধ্বে?
তিনি কি কালের উর্ধ্বে?

কবে এ ধর্মের আবির্ভাব হলো? কাদের উপর এ ধর্ম প্রযোজ্য হবে?মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনযাপনের প্রয়োজনে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ ধর্মে মানুষের সব সমস্যার সমাধান আছে কি?এ ধর্মে চিরসত্য বলে কিছু আছে? না সত্য আপেক্ষিক?এ ধর্ম আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে, না নিশ্চিত কোনো জ্ঞানে সাহায্যে রচিত হয়েছে? যদি নিশ্চিত কোনো জ্ঞানের সাহায্যে রচিত হয়ে থাকে- তবে সে জ্ঞানের উৎস কী? মানবধর্মে মানবের পরিসমাপ্তি ইহজগতে শেষ? না আর কোনো জগত আছে?মানবধর্ম রচয়িতাকে যদি প্রশ্ন করা হয়- 'আপনিও মানুষ, আমিও মানুষ, তাহলে আপনি কোন অধিকারবলে আপনার রচিত ধর্ম আমার উপর চাপিয়ে দিতে চান?'এর জবাব কী হবে?

৪. ইসলাম সাম্প্রদায়িক ধর্ম

ইসলাম ধর্মের উপর সেকুলাররা অভিযোগ উত্থাপন করে যে, ইসলাম একটি সাম্প্রদায়িক ধর্ম।সেকুলারদের এ অভিযোগ সঠিক নয় কারণ:ইসলাম কোনো মানুষের রচিত ধর্ম নয়। এ ধর্ম সমগ্র বিশ্বজগৎ ও সৃষ্টিকূলের স্রষ্টা মহান আল্লাহতায়ালা নাজিল করেছেন। এ ধর্মের পরিবর্তন, পরবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন করার অধিকার কোনো মানুষের নেই। ইহজগতের সর্বস্বীকৃত শ্রেষ্ঠতম মানুষ, সর্বশেষ নবী ও রসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) যার উপর আসমানি কিতাব আল কুরআন নাজিল হয়েছে- তাঁর নিজেরও ধর্মে কোনোকিছু সংযোজন কিংবা বিয়োজন করার কোনো অধিকার ছিল না।মহান আল্লাহতায়ালা বলেন- 'এই নবী যদি কোনো কথা রচনা করে আমার নামে চালিয়ে দিত, তাহলে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠশিরা ছিন্ন করে ফেলতাম। (সূরা হাক্কাহ, আয়াত ৪৪, ৪৫ ও ৪৬)
আল্লাহ মানুষের সৃষ্টিকর্তা। মানুষ আল্লাহর খলিফা তথা প্রতিনিধি। সৃষ্টির প্রতি তাঁর কোনো বৈষম্য নেই। তাঁর সৃষ্ট বাতাস, পানি, মাটি, আগুন, সূর্যের আলো, চাঁদের জোসনা, বৃষ্টির পানি, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফল-ফসল, গাছ, মাছ, পশু-পাখি ইত্যাদি কোনো সম্প্রদায় বিশেষের জন্য নয়, কোনো কালের জন্য নয়, কোনো এলাকার জন্য নয়, এগুলো সর্বকালের, সব এলাকার, সব মানুষের জন্য অতএব আল্লাহর প্রেরিত ধর্ম ইসলাম কোনো সম্প্রদায়ের জন্য নয়, কোনো কালের জন্য নয়, নয় কোনো বিশেষ এলাকার জন্য। আল কুরআনে মানুষকে আহ্বান করা হয়েছে এ ভাষায়- ইয়া আইয়ুহান নাস- হে মানবমণ্ডলী।সুতরাং ইসলামকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম বলা অযৌক্তিক ও অসঙ্গত।

৫. ইসলাম পবিত্র ধর্ম, পবিত্র ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনা উচিত নয়।

প্রথমত নীতিগতভাবে একটি কথা বলতে হয়। রাজনীতি যারা করেন, তারা জনগণের মন জয় করে তাদের ভোটে নির্বাচিত হতে চান। নির্বাচনের সময় একটি শ্লোগান সর্বত্র শোনা যায়। শ্লোগানটি হলো- 'অমুক ভাইর চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র।' সুতরাং যারা ফুলের মতো পবিত্র, তারাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং বিজয়ী হয়ে জনগণের খেদমত করতে চান। মানুষের খেদমত করা হক্কুল ইবাদ- সৃষ্টির সেবা অত্যন্ত পবিত্র কাজ। যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন, তারাই রাজনীতি করেন, তারাই সৃষ্টির সেরা মানুষ তথা দেশ ও দশের খেদমত করতে চান। তাদের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও নিয়ত পবিত্র আর তাদের চরিত্রও ফুলের মতো পবিত্র। অতএব তারা রাজনীতিকে অপরিচ্ছন্ন করবেন না। রাজনীতিকে পবিত্র রাখবেন- এটাই সর্বসাধারণের কাম্য।

দ্বিতীয়ত আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রদান করে সৃষ্টি করেছেন। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসহ মানুষের সম্পূর্ণ সত্তাকে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করার নামই ইসলাম।মানুষের কাছে আল্লাহর প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো ইসলাম। ইসলা মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার নাম। এখানে জীবনের এমন কোনো দিক নেই, যেদিক বাদ পড়েছে।আল্লাহ নিজেই বলেন- 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (ধর্ম) পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। আর আমার নিয়ামত পূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের জীবনবিধান হিসেবে কবুল করলাম।'(সূরা মায়েদা, আয়াত ৩)।

সেক্যুলারিজম ধর্মনিরপেক্ষ?

সেক্যুলারিজম নিজেই একটি ধর্ম। এই ধর্মের শরিয়ত কিংবা সাংবিধানিক মাপকাঠি হলো হিউম্যানিজম। এই ধর্মের প্রভু হলো মানুষ এবং জ্ঞানের উৎস হলো আকল। সেক্যুলারিজম নিজেই একটি ধর্মীয় অথরিটি সংরক্ষণ করে। সে অন্যান্য ধর্মের উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সকল ধর্মীয় অনুশাসনকে সে নিজস্ব মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করে। সে যদিও মুখে বলে যে সব ধর্ম তার স্বাধীনতা পাবে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সেক্যুলারিজম একজন ধার্মিক ব্যক্তিকে তার ধর্মে ঘোষিত হালাল গ্রহণ করতে এবং হারাম বর্জন করার পথে বাধা সৃষ্টি করে। তার নিজস্ব হালাল-হারাম তথা বৈধতা-অবৈধতার ধারণা রয়েছে। সেই ধারণার ভিত্তিতেই সে প্রতিটি বিষয়ের অনুমোদন দিয়ে থাকে। তার নিজস্ব বৈধতার ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক যেকোনো বিষয় সে বেআইনি এবং বাতিল করে দিতে পারে। মোটকথা, একটি ধর্মের ফুল কনসেপ্ট সেক্যুলারিজমে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং বলতে হবে, সেক্যুলারিজম কখনোই ধর্মনিরপেক্ষতা নয়; বরং সে নিজেই একটি ধর্ম।(হিউম্যান বিয়িং:শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব-১২৫)

হিজাব নিষিদ্ধ করা নিয়ে জার্মানির পরিস্থিতি সেক্যুলারিসমের অন্তর্নিহিত সাংঘর্ষিকতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ২০১৬ এর এক রিপোর্টে এসেছে:জার্মানীর প্রভাবশালী দুটি সংস্থা জার্মান বিচারক ও আইনজীবীদের মধ্যে হিজাবের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। তাদের মতে আদালতের 'নিরপেক্ষতা' বজায় রাখার জন্য এই নিষেধাজ্ঞা জরুরি।অ্যাসোসিয়েশন অফ জার্মান অ্যাডমিনস্ট্রেটিভ জাজেস এর চেয়ারম্যান রবার্ট সিগমুলারের মতে-বিচারের ফলাফল কেবল আইনের ওপর নির্ভরশীল, কোনো ব্যক্তির ওপর না-তা দেখানোর জন্য বিচারক ও আইনজীবীদের নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরা উচিত। সেই নির্ধারিত ইউনিফর্ম হলো কালো আলখেল্লা, সাদা শার্ট, সাদা বো- টাই এবং গলবন্ধ কিংবা নেকারচিফ। [১০]"

এই কালো আলখেল্লার উৎস কী জানেন?নিউইয়র্ক টাইমসের গবেষকদের মতে,'বিচারিক পোশাকের (judicial robe) আদি উৎস যদিও সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে অনেকেই মনে করেন এটি এসেছে গির্জার পাদরিদের কালো আলখেল্লা থেকে। অতীতে গির্জা আর বিচারবিভাগ আজকের মতো আলাদা ছিল না। ব্রিটেনের বিচার বিভাগে কালো আলখেল্লার ব্যবহার শুরু হয় চতুর্দশ শতাব্দীতে'।একদিকে কালো আলখেল্লাকে সেক্যুলার সাব্যস্ত করা আর অন্যদিকে হিজাবকে ধর্মীয় আখ্যা দেয়ার পুরো ব্যাপারটাই সেক্যুলারিসমের কথিত নিরপেক্ষতার অন্তঃসারহীনতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এভাবেই সেক্যুলারিসম এক বানোয়াট 'নিরপেক্ষতা' তৈরি করে কৃত্রিমভাবে নিজের 'পক্ষপাতশূন্যতা' বজায় রাখার জন্য।ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা 'নিরপেক্ষতা' প্রমাণ করতে চাচ্ছে, তার উৎস ধর্মীয়-এটুকু পরিষ্কার।(সংশয়বাদী:৪৫-৪৭)

ধর্মনিরপেক্ষতা আর ধর্মীয় স্বাধীনতার বুলি আওড়ালেও পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিমদের ইসলামের বিধান মানতে বাধা দেয় এবং অনেক ক্ষেত্রে বিধান অমান্য করতে বাধ্য করে। এটাই প্রমাণ করে সেক্যুলারিজমের নিরপেক্ষতা আসলে মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই না।আসলে নিরপেক্ষতা বলে কিছু নেই। নিরপেক্ষতার নামে পশ্চিমারা তাদের মূল্যবোধ আর সাংস্কৃতিক রীতিনীতি অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়।(সংশয়বাদী-৫১)

সেক্যুলারিজম সমাজব্যবস্থার স্বরুপ

নৈতিকতার মাপকাঠিকে পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করে সেক্যুলারিজম সেখানে বসায় মানবীয় খেয়ালখুশিকে। একটা সেক্যুলার রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক, ফ্যাশিস্ট, নাকি সমাজতান্ত্রিক, তাতে কিছু যায় আসে না। কাঠামো যা-ই হোক সেক্যুলারিজম নৈতিকতার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে মানুষের খেয়ালখুশিকে, সেই খেয়ালখুশি হতে পারে একজন স্বৈরশাসকের, গুটিকয়েক নেতার অথবা সংখ্যাগুরুর।

'তুমি কি তাকে দেখোনি, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে? তবুও কি তুমি তার যিম্মাদার হবে?' (সূরা আল-ফুরক্বান, ৪৩)

মানুষের খেয়ালখুশি এবং কামনা-বাসনা প্রায় প্রতিনিয়ত বদলাতে থাকে।তাই এগুলোর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং আদর্শও বদলাতে থাকে ক্রমাগত। এক যুগের অসুস্থতা আরেক যুগের আবশ্যিকতা হয়ে দাঁড়ায়, এক সময়ের অন্যায় অন্য সময়ে পরিণত হয় বৈধ কিংবা প্রশংসনীয় কাজে। কোনো সমাজকে যখন মানুষের সহজাত নৈতিকতা এবং অন্তর্নিহিত ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয় তখন দুটো ব্যাপার ঘটে।

অতি দ্রুত এবং অনিশ্চিত গতিতে ভালোমন্দের সংজ্ঞা বদলায়, এবং পর্যায়ক্রমে সমাজ এগিয়ে যায় নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের দিকে। আজকের পশ্চিমা সেক্যুলার সমাজে এ দুটো ব্যাপারই ঘটছে। আর সেক্যুলারায়নের সাথে সাথে ঘটতে শুরু করেছে আমাদের সমাজেও। যার সাক্ষ্য দিচ্ছে জাহাঙ্গীর নগরের ছাত্রী হস্টেলের ট্রাঙ্কে বন্দী আর ডাস্টবিনে পড়ে থাকা পলিথিনে প্যাঁচানো পরিত্যক্ত অপাপবিদ্ধ শিশুদের মৃতদেহ, পর্নোগ্রাফি আর মাদকের নেশায় আসক্ত লক্ষ লক্ষ শিশু-কিশোর-যুবকদের অন্ধকারে ক্ষয়ে ক্ষয়ে নীরব নিভৃত ধ্বংস, আর পাইকারী হারে ধর্ষিত, নির্যাতিত আর খুন হওয়া নারীদের মিছিল।

দুটি মৌলিক নীতি যেগুলোকে আধুনিক গণতান্ত্রিক সেক্যুলার সমাজগুলো তাদের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে।প্রথমটি হলো, সংখ্যাগুরুর মতকে ভালো-মন্দ নির্ধারণের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ

করা।দ্বিতীয়টি হলো, ব্যক্তিস্বাধীনতা।মজার ব্যাপার হলো, এ দুটি নীতি একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক। তৃতীয় কোনো মূলনীতির অধীনে এদের মধ্যে মিটমাট না করে দিলে এ দুটোর মধ্যে সংঘর্ষ অবধারিত।সেক্যুলারিজম সহজাতভাবে ধর্মকে অস্বীকার করে। পাশাপাশি মানবজাতির জন্য কোনটা উপকারী আর কোনটা ক্ষতিকর সেটা ঠিক করার ক্ষেত্রে ফিতরাহকে (সহজাত মূল্যবোধ) গোনায় ধরে না। কোন আচরণগুলো বৈধ ও উপযুক্ত তা ঠিক করার মানদণ্ড হিসেবে সংখ্যাগুরুর মত আর ব্যক্তিস্বাধীনতার মূলনীতিকে গ্রহণ করার কোনো বিকল্পও তাই সেক্যুলার সমাজের থাকে না।

সেক্যুলার সমাজে এ দুটো নীতির বিভিন্ন বিকৃত ফলাফল সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন বিতর্কিত ইস্যু থেকে স্পষ্ট। যেমন: এসব সমাজে একদল মানুষ সমকামিতাকে মেনে নেয়ার কথা বলে। সামরিক বাহিনী থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে এরা সমকামীদের সমান অধিকার চায়। তাদের এ দাবির ভিত্তি হলো ব্যক্তিস্বাধীনতা তথা ব্যক্তি- অধিকারের মূলনীতি। ব্যক্তিস্বাধীনতার নীতি অনুযায়ী একজনের 'যৌনতা' নিয়ে আরেজনের কথা বলার অধিকার নেই। অন্যদিকে গর্ভপাতের পক্ষেও ঠিক একই যুক্তি দেয় আরেকদল। এরা বলে, 'আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা আমার আছে। আমার শরীরের কী হবে, সেটা ঠিক করব আমি। এখানে অন্যদের কথা বলার কোনো অধিকার নেই।' এ কথার বিপরীতে বিরোধী পক্ষ কেবল এটুকুই বলতে পারে যে, এ ধরনের আচরণ সমাজের অধিকাংশ মানুষের মূল্যবোধের পরিপন্থী। যদিও বাস্তবতা হলো তাদের অনেকেই গর্ভপাতের বিরোধিতা করে নৈতিক ও ধর্মীয় জায়গা থেকে। কিন্তু সেক্যুলার সমাজের সেক্যুলার সদস্য হিসেবে সেটা তারা মুখ ফুটে বলতে পারে না। কারণ, সেক্যুলার সমাজ কখনো সেটা মেনে নেবে না। নৈতিকতা ও ধর্মের কোনো স্থান সেক্যুলার সমাজে নেই।

আজকের সেক্যুলার সমাজে যেসব আচরণকে জঘন্য মনে করা হচ্ছে, যেমন: ধর্ষণ কিংবা শিশুদের ওপর যৌন-নির্যাতন, এগুলোকে ঘৃণ্য অপরাধ মনে করার একমাত্র কারণ হলো এগুলোর ব্যাপারে মানুষের বর্তমান মনোভাব। কিন্তু এ মনোভাব কাল বদলে যেতে পারে। যেমন ব্যভিচার, বহুগামিতা ও সমকামিতার ব্যাপারে পশ্চিমের মনোভাব বদলেছে। একসময় সমকামিতাকে জঘন্য যৌনবিকৃতি আর অসুস্থতা মনে করা হতো, আর এখন সমকামীদের 'বিয়ে'কে আইনি বৈধতা দেয়া হচ্ছে। আর এর বিরোধিতাকে বলা হচ্ছে 'ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ'। মানুষের মনোভাব বদলানোর সাথে সাথে বদলে গেছে নৈতিকতা।একইভাবে মনোভাব বদলে গেলে আজকের অবৈধ কাজগুলোকে আর ঘৃণ্য অপরাধ মনে করা হবে না; বরং বৈধ কিংবা প্রশংসনীয়ও ভাবা হতে পারে। অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাধীনতার মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে ভয়ংকর সব অপরাধও এক সময় পেতে পারে সামাজিক ও আইনি বৈধতা।

ইসলামের দৃষ্টিতে সেক্যুলারিজম

ইসলাম কিছু বিশ্বাস, তার মৌখিক স্বীকৃতি ও সেই অনুযায়ী নিজের জীবনের সকল ক্ষেত্র পরিচালনার নাম। অন্য কথায় ইসলাম একটি ধর্মীয় আদর্শ ও ধর্মীয় জীবনব্যবস্থা। ধর্মহীনতা বা Secularism এর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্কতো নেই-ই বরং এ মতবাদ ইসলামের বিপরীত মতবাদ।সেক্যুলারিজম দু'টি মৌলিক কারণে ইসলামের বিরোধী। ১. 'তাওহীদে ইবাদত' তথা দাসত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করায় এটি পরিষ্কারভাবে কুফরী মতবাদ। ২. আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিপরীত বিধান দেওয়ায় এটি স্পষ্টভাবে ত্বাগুতী মতবাদ।

হাতে গোনা কিছু নাস্তিক ব্যতীত পূর্বকালের ও আধুনিক কালের তাবৎ কাফির ও মুশরিক সমাজ সকল ক্ষমতার অধিকারী একজন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী। এভাবে আল্লাহকে স্রেফ 'রব' হিসাবে স্বীকার করাকে বলা হয় 'তাওহীদে রুবুবিয়াত'। পক্ষান্তরে সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র বিধান সমূহ কবুল করাকে বলা হয় 'তাওহীদে ইবাদত' বা উলুহিয়াত। তাই কেবল তাওহীদে রুবুবিয়াতকে স্বীকার করলেই কেউ ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না। যেমন আবু জাহল আল্লাহকে 'রব' হিসাবে স্বীকার করা সত্ত্বেও তাকে মুসলমান বলা হয়নি। তাই মুসলমান কেবল তিনিই হ'তে পারেন, যিনি ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব কবুল করেন ও সাধ্যমত তাঁর আদেশ-নিষেধ সমূহ বাস্তবায়ন করেন।

সেক্যুলারিজম মতবাদ বেশীর বেশী কেবল তাওহীদে রুবুবিয়াতকে স্বীকার করে। কিন্তু তাওহীদে ইবাদতকে কোন অবস্থাতেই স্বীকার করে না। এই মতবাদ মানুষের উপরে মানুষের রচিত বিধান সমূহ চাপিয়ে দেওয়ায় বিশ্বাসী। ফলে মানুষ মানুষের দাসত্ব করতে বাধ্য হয়। অথচ মানুষ কেবল তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দাসত্ব করতে এবং তাঁর বিধান মানতে বাধ্য, অন্য কারও নয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহর বিধান মান্য করার মধ্যেই রয়েছে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা এবং রয়েছে তার ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি।

“তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের আলেম ও পীর-আউলিয়াদেরকে এবং মরিয়মপুত্র ঈসাকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছিল। অথচ তাদের কেবলমাত্র এক আল্লাহর দাসত্ব করতে হুকুম দেওয়া হয়েছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তারা যে শিরক করে, তা হ'তে তিনি পবিত্র”' (তওবা ৯/৩১)।

'তবে কি তারা জাহেলিয়াতের বিধানসমূহ কামনা করে? বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর চাইতে সুন্দর বিধানদাতা আর কে আছে'? (মায়েদাহ ৫/৫০)।

যারা মনে করেন সেক্যুলারিজমের অর্থ ধর্মহীনতা নয় বরং ধর্মকে ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ করা, ধর্মকে জীবনের কিছু ক্ষেত্র থেকে পৃথক করে একই সময়ে মুসলিম ও সেক্যুলার থাকার পথ খোঁজেন, সেটা মূর্খতা বৈ কিছু নয়।ইসলাম অবিভাজ্য একটি জীবনব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি শাখা প্রশাখায় ইসলামের রয়েছে নিজস্ব নিয়ম পদ্ধতি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামকে মানলেই ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে মানা হয়। আর জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে ইসলামকে বাদ দিলে ইসলামের আংশিক পালন করলাম বলে মনে করলেও আসলে ইসলামই পালন হয় না। কেননা ইসলামের মূল রূপ হচ্ছে আল্লাহর সমীপে আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য প্রদর্শন। আংশিক আনুগত্য করা আর অন্যান্য ক্ষেত্রে আনুগত্যহীনতা মূলত আনুগত্যহীনতাকেই প্রমাণ করে। যেমন: একজন চাকরিজীবী তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার দু'একটি পলিসির বিরোধিতা করলে তার চাকরি নিয়ে টান পড়াটাই স্বাভাবিক। সে জন্য সেক্যুলারিজমের প্রবক্তারা ব্যক্তিজীবনে ইসলাম মানার কথা বললেও তারা পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অন্য নিয়ম মেনে চলার কারণে তাদের ইসলাম নিয়ে দোটানায় পড়াটাই স্বাভাবিক।

তাহলে ব্যক্তিজীবনে মুসলিম, আর অন্য জীবনে অমুসলিম থাকাকে অনিবার্য করে জীবনের দু'একটি ক্ষেত্রে যারা আল্লাহর আনুগত্য দেখান আর অন্য ক্ষেত্রে আনুগত্যহীন হওয়া মূলত তাদের পূর্ণ আনুগত্যহীন হওয়ারই শামিল। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলা হয়েছে, "পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। "এর অর্থ হচ্ছে মুসলিম হতে হলে পূর্ণভাবে হতে হবে। সুতরাং সেক্যুলারিজমের ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে যারা জীবনের কয়েকটি ক্ষেত্রে ধর্মকে অনুশীলন করে জীবনের অন্য ক্ষেত্রে ধর্মের প্রতি বৃদ্ধাঙুলি দেখিয়ে মুসলিম থাকতে চায়- তাদের এ চাওয়া একেবারেই অসম্ভব। কথায় আছে, 'আল্লাহ ডি খোশ রাহে ভগবান ভি নারাজ

না হো যায়ে'- মূলত কোন মুসলিমের চরিত্র হতে পারে না। অতএব, সেক্যুলারিজমের যে কোন ব্যাখ্যাই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক; এতে কোন সন্দেহ করার অবকাশ নেই।

ইসলাম ও সেক্যুলারিজমের সংঘর্ষের প্রধান দিকসমূহ

পৃথিবীতে মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ দ্বীন হ'ল 'ইসলাম' (আলে ইমরান ৩/১৯) এবং ইসলামই বর্তমান পৃথিবীতে একমাত্র ইলাহী ধর্ম।যা মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে হেদায়াতের সর্বোত্তম আলোকবর্তিকা স্বরূপ। ফলে কথিত অন্যান্য ধর্মের সাথে ইসলামকে তুলনা করা বাতুলতা মাত্র। অতএব প্রচলিত খ্রিষ্টান ধর্মের অপূর্ণতা ও তাদের ধর্মযাজকদের বাড়াবাড়ির প্রতিবাদে সৃষ্ট 'ধর্মনিরপেক্ষ' মতবাদ ইসলামের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা মারাত্মক অন্যায়। বরং এটাই বাস্তব যে, কথিত অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিতে মুসলমানেরাই সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত এবং ইসলামই তাদের প্রধান টার্গেট। নিম্নে ইসলামের সাথে প্রচলিত সেক্যুলারিজমের সংঘর্ষের প্রধান দিকসমূহ উল্লেখ করা হ'ল।-

(১) ইসলাম আল্লাহ প্রেরিত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক সকল বিষয়ের হেদায়াত এতে মওজুদ রয়েছে। পক্ষান্তরে সেক্যুলারিজমের মতে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। অতএব আধ্যাত্মিক বিষয়ের বাইরে বৈষয়িক ও সামাজিক ব্যাপারে ধর্মের কোন আবশ্যকতা নেই।

(২) ইসলামের মতে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হলেন আল্লাহ। আইন ও বিধানদাতাও তিনি। পার্লামেন্টের সদস্যগণ সেই আইনের বাস্তবায়ন করবেন মাত্র। প্রয়োজনে উক্ত আইনের অনুকূলে আরও বিধান রচনা করবেন। কিন্তু আল্লাহ্ আইনের প্রতিকূলে কোন আইন রচনার অধিকার তাদের নেই। আর করলেও 'আমীর' বা প্রেসিডেন্ট তা বাতিল করবেন।পক্ষান্তরে সেক্যুলারিজমের মতে জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। পার্লামেন্টে জনগণের নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই সেই সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে। তারাই তাদের খেয়াল-খুশীমত আইন রচনা করবে। এখানে আল্লাহ্র আইনের প্রবেশাধিকার নেই। ফলে জাতীয় সংসদের কোন সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ আইনের বিরোধী হলেও সেটা তাদের দৃষ্টিতে কোন অন্যায় নয়। কেননা এগুলো বৈষয়িক ব্যাপার। তাতে প্রেসিডেন্টের ভেটো দেওয়ারও এখতিয়ার নেই। জনপ্রতিনিধিদের অধিকাংশের রায় এখানে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে, আল্লাহর আইন নয়।

(৩) ইসলামের মতে ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ। সেক্যুলারিজমের মতে ঐ মাপকাঠি হ'ল মানুষের জ্ঞান। দল বা দলীয় নেতার সিদ্ধান্ত, General Will-এর নামে Party Will বা জাতীয় সংসদের সিদ্ধান্ত কিংবা আদালতের রায়ই সেখানে চূড়ান্ত সত্যের মাপকাঠি।

(৪) সেক্যুলারিজমের প্রধান লক্ষ্য হ'ল মানব জীবন থেকে ধর্মকে নির্বাসন দেওয়া। পক্ষান্তরে ইসলামের প্রধান লক্ষ্য হ'ল মানব জীবনকে ইসলামের বিধান মোতাবেক গড়ে তোলা।

(৫) সেক্যুলারিজম মানুষের জীবনকে বিভক্ত মনে করে। পক্ষান্তরে ইসলাম মানব জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগকে অবিভাজ্য মনে করে।

'লাকুম দ্বীনকুম ওলিয়াদ্বীন'

দেশের কিছুলোক প্রচার করে কুরআন শরীফ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ সমর্থন করে। প্রমাণ হিসেবে তারা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত উদ্ধৃত করেন:

'লাকুম দ্বীনকুম ওলিয়াদ্বীন'- 'তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন আর আমার জন্য আমার দ্বীন।'

বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক:

এ আয়াতটি কুরআন শরীফের ১০৯ নং সূরা আল-কাফিরুনের ৬ নং এবং শেষ আয়াত। এ সূরার নাম কাফিরুন অর্থাৎঅস্বীকারকারীগণ। কাফির শব্দটিকে আমাদের সমাজে গালি মনে করা হয়। কাফির শব্দের অর্থ অস্বীকারকারী। যে তাওহিদ, রেসালাত ও আখিরাত স্বীকার করে না সেই হলো কাফির, সে অস্বীকারকারী।এ সূরা নাজিলের ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন- মক্কার কুরাইশ সর্দারগণ রাসূল (সা.) কে বলল- 'আমরা আপনাকে এতবেশি পরিমাণ ধন-সম্পদ দেব, যার ফলে আপনি মক্কার সবচেয়ে বেশি ধনী হয়ে যাবেন। যে মেয়েটি আপনি পছন্দ করেন, তার সাথে আপনার বিয়ে দিয়ে দেব। আমরা আপনার পেছনে চলতে প্রস্তুত। আপনি শুধু আমাদের একটি কথা মেনে নেবেন- আমাদের উপাস্যদের নিন্দা করা থেকে আপনি বিরত থাকবেন। এ প্রস্তাবটি আপনার পছন্দ না হলে, আমরা আরো একটি প্রস্তাব পেশ করছি- এ প্রস্তাবে আপনার লাভ, আমাদেরও লাভ।' রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন সেটা কী? তারা বলল- 'এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন এবং আমরা এক বছর আপনার উপাস্যদের ইবাদত করব।'

রাসূল (সা.) বললেন- 'থামো! আমি দেখি আমার রবের পক্ষ থেকে কী হুকুম আসে।'

এ সময় এ সূরাটি নাজিল হয়। সূরার বাংলায় তরজমা:

(হে রাসূল) আপনি বলে দিন, হে কাফিরগণ! তোমরা যাদের ইবাদত কর, আমি তাদের ইবাদত করি না। আর আমি যার ইবাদত করি, তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও। তোমরা যাদের ইবাদত করছ, আমি তাদের ইবাদতকারী নই। আর আমি যার ইবাদত করি, তোমরা তার ইবাদত করবে না। তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আর আমার জন্য আমার দ্বীন।

এ সূরার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) পরিষ্কার ভাষায় কাফেরদেরকে জানিয়ে দিলেন- 'আমার দ্বীন আলাদা এবং তোমাদের দ্বীনও আলাদা। আমার পথ ও তোমাদের পথ কখনও এক হতে পারে না। তোমাদের দ্বীন ও আমার দ্বীনের মধ্যে কোনো রকম আপোষ রফা কখনও সম্ভব নয়।'

এ আয়াতের সমার্থক আয়াত সূরা আয-যুমার এ আছে:

'হে নবী এদের বলে দাও, আমি তো আমার দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে তাঁরই ইবাদত করব, তোমরা তাকে বাদ দিয়ে যার বন্দেগি করতে চাও করতে থাক।' (আয়াত-১৪)

'এদেরকে বলে দাও- হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা নিজেদের জায়গায় কাজ করে যাও। আমিও আমার কাজ করতে থাকব। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার উপর অপমানকর আজাব আসবে এবং কার উপর ঐ আজাব আসবে,যা চিরস্থায়ী হবে।' (আয়াত ৩৯-৪০)

সূরা কাফিরুনের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তার রাসূলকে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় শিখিয়ে দিলেন যে, আপনি অস্বীকারকারীদেরকে এভাবে বলুন- 'তোমাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পৌছানোর উদ্দেশ্যেই আমি ইবাদতের সঠিক নিয়ম শিক্ষা দিচ্ছি। আমি যার ইবাদত করছি, একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি। এ উপদেশ মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। এ বিষয়ে তোমাদের সাথে কোনো রকম আপোষ করার প্রশ্ন ওঠে না।'অতএব কুরআন মজিদের উপরোক্ত আয়াত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, এ আয়াত সেকুলারিজমের সমর্থনকারী কোনো আয়াত নয় বরং ঠিক তার উল্টো।

'একজন ধার্মিক লোক কি ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) হতে পারে?

উত্তর: একজন ধার্মিক ব্যক্তি তাঁকে বলা হয়, যিনি সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর হুকুম আহকাম, বিধি-বিধান আসমানি কিতাব, ধর্মগ্রন্থ, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, শেষ বিচার, জান্নাত-জাহান্নাম, স্বর্গ-নরক, বিশ্বাস করেন এবং সৃষ্টিকর্তার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্য তাঁর প্রতিটি আদেশ-নিষেধ ইহজগতে যতোদূর সম্ভব মানার চেষ্টা করেন।

দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে একজন ধার্মিক ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) হতে পারে না। কেননা ধর্মনিরপেক্ষ দর্শন ইহজগৎ ও ইহজাগতিকতার বাইরে কোনো কিছু বিশ্বাস করে না। সৃষ্টিকর্তাকে ইহজগতে দেখা যায় না। আসমানি কিতাব, পুনরুত্থান, স্বর্গ-নরক ইহজাগতিক কোনো বিষয় নয়। তাই ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনে এ বিষয়গুলোর কোনো স্থান নেই। ফলে বিশ্বাসগত দিক দিয়ে কোনো ধার্মিক ব্যক্তির ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) হবার প্রশ্ন ওঠে না।

এক ব্যক্তি একদিক দিয়ে হবেন ধার্মিক ধর্মের পক্ষের লোক- আবার স্বয়ং তিনি হবেন ধর্মনিরপেক্ষ তথা Secular অর্থাৎ যে ধর্মের পক্ষে নয়, যিনি ধর্ম থেকে আলাদা-Independent, যার ধর্মের উপর বিশ্বাস-ভরসা-নির্ভরতা কিছুই নেই- এ যেন এক দেহের, একই অঙ্গের পরস্পরবিরোধী দুই রূপ- সোনার পাথরবাটি- বাস্তবে যার কোনো অস্তিত্ব নেই।ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের অধীনে একজন ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত গণ্ডির মধ্যে সৃষ্টিকর্তাকে মানা এবং তাঁর পূজা-উপাসনা, ইবাদত-বন্দেগি করার ব্যাপারে কোনো আপত্তি করা হয় না। এ সুযোগ লাভ করে কোনো ব্যক্তি কি তার ধর্মের পূর্ণ হক আদায় করতে পারবে?

ধরুন জনৈক আবদুল্লাহ সাহেব- তিনি একজন একনিষ্ঠ, অনুগত মুসলমান। ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের অধীনে থেকে তিনি কি হক আদায় করে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে পারবেন? মনে করুন- আবদুল্লাহ সাহেবের পারিবারিক সমস্যা সৃষ্টি হলো। তার স্ত্রী বিষয়টি আদালতে নিয়ে গেল। কিংবা তার পিতার মৃত্যু হলো। সম্পত্তি নিয়ে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলো। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি আদালতে গেল। এ পরিস্থিতিতে আবদুল্লাহ সাহেব তার পরিবার ও উত্তরাধিকারীদের মধ্যে আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে দিতে পারবেন?

আবদুল্লাহ সাহেব ধার্মিক লোক। তিনি কুরআন তেলাওয়াত করেন। তিনি সূরা মায়িদার ৪৪ নং আয়াতে পড়লেন- 'যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না- তারাই কাফির।' তিনি কি এই আয়াতের প্রতি আমল করতে পারবেন? তিনি নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়নকালীন সময়ে তার নজরে আসল:

দাওয়াত, ইসলাহ, রিসালাত, নবীর অনুসরণ, সত্যের সাক্ষ্য, শাহাদাত, বাইয়াত, আল্লাহর পথে ব্যয়, জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, জাকাত, সুদ, জুয়া, লটারি, ধনসম্পদ উপার্জন ও ব্যয় করার পন্থা, ইসলামের হারাম-হালাল বিধান, শ্রমিকের অধিকার, নারীর অধিকার, পিতামাতার অধিকার, প্রতিবেশীর হক, শিক্ষানীতি, বিচারব্যবস্থা, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, সৃষ্টির মালিকানা, পৃথিবী ও তার প্রতিটি অংশের মালিকানা, খেলাফত, যুদ্ধ ও সন্ধি আইন, শাসন শাসিতের সম্পর্ক, জুলুমবাজ সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের করণীয়, হক্কুল্লাহ, হক্কুল ইবাদ, আমর বিন মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার ইত্যাদি। তিনি কি এ বিষয়গুলোর উপর হক আদায় করে আমল করতে পারবেন?

জনাব আবদুল্লাহ নামাজে ও নামাজের বাইরে দিনে রাতে বার বার উচ্চাণ করেন 'আল্লাহু আকবর- আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক' আল্লাহ যদি সর্বশ্রেষ্ঠ হন, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হন, তাহলে তাঁর দেয়া হুকুম- আহকাম, বিধি-বিধান কি শ্রেষ্ঠ নয়? এগুলো কি মানবরচিত আইনের অধীনে থাকবে? যে আইন রাষ্ট্র ও সমাজ, ব্যক্তি কিংবা পরিবার যে স্তরে প্রয়োগ হওয়া দরকার, তিনি কি তা প্রয়োগ করতে পারবেন? ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি কি সব আইন-কানুন মানার পরিবেশ পাবেন?

এতদসত্ত্বেও আবদুল্লাহ সাহেব সৃষ্টিকর্তার প্রতি ঈমান এবং যতদূর সম্ভব ইবাদত- বন্দেগি করার চেষ্টা অব্যাহত রাখলেন, কিন্তু তার ভবিষ্যৎ বংশধররা কি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আল্লাহকে চেনা-জানার পরিবেশ পাবে? তারা যখন দেখবে সৃষ্টিকর্তা ব্যক্তিজীবনের বাইরে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনে বিচার ফয়সালায়, রাষ্ট্র পরিচালনায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনে কোনো বিধি-বিধান দিতে সক্ষম নন, তখন তারা কি ব্যক্তিগত জীবনে সৃষ্টিকর্তার উপর ঈমান আনার, তাঁর ইবাদত-বন্দেগি, পূজা-উপাসনা করার যুক্তি খুঁজে পাবে?বিষয়টির গভীরে অনুপবেশ করলে পরিষ্কার হয় যে, ধার্মিক, ধর্মানুরাগী, ধর্মের পক্ষের লোক আর ধর্মনিরপেক্ষ, Secular লোক- যে ধর্মের পক্ষে নয়, যার ধর্মের উপর ভরসা কিংবা নির্ভরতা নেই, যে ইহবাদী বা ইহজাগতিকতাবাদী, তাদের উভয়ের মধ্যে চিন্তা-চেতনায়, ধ্যান-ধারণায়, ঈমানে-বিশ্বাসে, কার্যকলাপে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হবেই।

বস্তুত আমাদের পৃথিবীতে, ইহজগতে বিপরীতমুখী দ্বন্দ্ব-সংঘাত সর্বত্র বিরাজমান। আলোর সাথে আঁধারের, সত্যের সাথে মিথ্যার, নীতির সাথে নীতিহীনতার, ইলেকট্রনের সাথে পজিট্রনের বিপরীতমুখী অবস্থান সবার কাছে পরিলক্ষিত হয়। এভাবে ধার্মিকতার সাথে অধার্মিকতার বিপরীতমুখী অবস্থান, উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত একটি চিরন্তন সত্য, ঘটমান বিষয় (Phenomenon). এ বিপরীতমুখী অবস্থান, এ দ্বন্দ্ব-সংঘাতে যদি ধার্মিকতার পক্ষের শক্তির মোকাবেলায় অধার্মিকতার পক্ষের শক্তির বিজয় হয় এবং রাষ্ট্রে তাদের কর্তৃত্ব ও শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে এ রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, আর এ রাষ্ট্রের পরিচালকদের নিয়ন্ত্রিত সমাজ

হয় ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ। ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ও রাষ্ট্রে নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করা হয়।

সেক্যুলারিজমের কুফল

ইসলামী বিশ্বে সেক্যুলারিজমের বিস্তারের ফলে মুসলিমদের দ্বীন ও দুনিয়া ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এখানে আমরা তার কিছু কুফল বর্ণনা করছি:

১. সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা বিস্তারের ফলে রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর বিধানকে নিষিদ্ধ করা, জীবনের সকল শাখা থেকে শরীয়তকে বিতাড়িত করা এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত ওহীর পরিবর্তে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী কাফেরদের তৈরি বিধানকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আল্লাহর বিধানকে মানা ও মানব-রচিত বিধান প্রত্যাখ্যান করার আহ্বানকে তারা প্রগতির অন্তরায়, পশ্চাৎগামী ও রক্ষণশীলতা জ্ঞান করে। আল্লাহর দিকে দা‘ঈ বা আহ্বানকারীদেরকে তারা নানাভাবে হেয় ও উপহাস করে, সরকারি চাকুরী ও ক্ষমতা থেকে দূরে রাখে, যেন তারা জাতি ও যুবকদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম না হয়।

২. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীদের কাজই হচ্ছে ইসলামী ইতিহাসকে বিকৃত করা, তাতে মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটানো ও দিগ্বিজয়ী ইসলামী আন্দোলনের ফসল স্বর্ণযুগকে ব্যক্তি স্বার্থ ও জঙ্গীবাদ বা জংগলীপনার ফলাফল বলে গালমন্দ করা এবং সমাজে এ জাতীয় ধ্যান-ধারণা তৈরি করা।

৩. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার সেবাদাসরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তাদের সেকুলার মতাদর্শের সেবক বানানোর কাজে লিপ্ত। এ কাজ তারা বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করে, যেমন:

ক. শিক্ষা উপকরণ ও সিলেবাস দ্বারা ছাত্রদের মাঝে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রচার করা।

খ. ধর্মীয় শিক্ষার নির্ধারিত সময় সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসা ও সংকুচিত করা।

গ. নির্দিষ্ট কতক ধর্মীয় বিষয় পাঠদানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, যে বিষয়গুলো সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের শিকড় উপড়ে ফেলতে পারে কিংবা সে মতবাদের ভ্রষ্টতার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

ঘ. শরীয়ত তথা কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন ভাষ্যের ব্যাপারে বিভ্রান্তি ও অপব্যাখ্যা ছড়িয়ে বিকৃতি ঘটানো, যেন মানুষ বুঝে শরীয়ত সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমর্থন করে, অথবা ন্যূনতম পক্ষে বুঝে যে, ইসলামের সাথে তার সংঘর্ষ নেই।

ঙ. পূর্ণাঙ্গভাবে দ্বীন পালনকারী শিক্ষকদেরকে পাঠদান ও শিক্ষাঙ্গন থেকে দূরে রাখা এবং ছাত্রদেরকে তাদের সাথে মিশতে না দেওয়া। এ কাজ তারা বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করে, যেমন দাফতরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজে তাদেরকে ব্যস্ত রাখা, অথবা অর্থ উপার্জনের অন্য কোনো পথে তাদেরকে মগ্ন করে দেওয়া।

চ. ধর্মীয় বিষয়কে গুরুত্বহীন ও অতিরিক্ত বিষয়ের মান দেওয়া, যেমন শেষ পিরিয়ডে রাখা, যখন ছাত্রদের মাঝে ক্লান্তির ভাব সৃষ্টি হয়, যেন তারা ধর্মীয় শিক্ষায় উজ্জীবিত না হয়। আবার এমনভাবে এ বিষয়কে শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যে এর সাথে ছাত্রদের পাশ-ফেলের সম্ভাবনা না থাকা।

৪. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, সত্য দ্বীনের অনুসারী ও মিথ্যা-বিকৃত দ্বীনের অনুসারী যেমন মুসলিম-ইয়াহূদী-খৃস্টান ও নাস্তিকদের থেকে পার্থক্য তুলে দেয়া, অতঃপর সবাইকে এক মানদণ্ডে রাখা ও বাহ্যিকভাবে সবাইকে সমান মর্যাদা দেয়া, যদিও সত্যিকার অর্থে তারা কাফের, নাস্তিক, পাপাচারী ও অপরাধীদেরকে তাওহীদের ধারক-বাহক, আল্লাহর আনুগত্যকারী ও ইমানদার লোকদের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।এ মতবাদের সামনে মুসলিম, খৃস্টান, ইয়াহূদী, ব্রাহ্মণ, মূর্তিপূজক সবাই সমান, তাদের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব তখনই তাদের কাছে মুখ্য হবে যখন কেউ তাদের মতবাদের আহ্বানে সাড়া দিবে।এ মতবাদের ধ্বজাধারীদের দৃষ্টিতে খৃস্টান, ইয়াহূদী, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ বা সমাজতন্ত্রীর সাথে মুসলিম নারীর বিয়ে বৈধ, কোনো সমস্যা নেই, অনুরূপ তার দৃষ্টিতে মুসলিম দেশে ইয়াহূদী অথবা খৃস্টান অথবা অন্য কোনো কুফরি ধর্মের অনুসারীর শাসক হতে সমস্যা নেই।তারা জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদের আড়ালে মুসলিম দেশের কর্তৃত্ব কাফেরদের হাতে তুলে দিতে চায়।বরং জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদ ও দেশের অখণ্ডতাকে মূলনীতি ও একমাত্র ঐক্যের বন্ধন হিসেবে দেখে। কুরআনুল কারীমের যে অংশ অথবা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদিস তাদের এ তথাকথিত জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদ নীতি বিরুদ্ধ হয়, তাকেই তারা ছুড়ে ফেলে ও প্রত্যাখ্যান করে। আর বলে: এটা দেশীয় একতা ও ঐক্য বিনষ্টকারী!

৫. এ মতবাদের অন্যতম একটি লক্ষ্য হচ্ছে, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার প্রসার করা এবং পারিবারিক সিস্টেম ধ্বংস করা। এ জন্য তারা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যেমন:

ক. অশ্লীলতাকে বৈধতা দেওয়া ও তার জন্য কাউকে শাস্তি প্রদান করা যাবে না মর্মে আইন প্রণয়ন করা; যার দৃষ্টিতে ব্যভিচার ও সমকামিতা ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত, যে ব্যক্তি স্বাধীনতা! প্রত্যেকের জন্য নিশ্চিত করা জরুরি।

খ. শালীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী ও সেগুলোর সহায়তায় নিয়োজিত পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও রেডিও-টেলিভিশনের অনুমোদন দেওয়া ও তাতে অংশ গ্রহণ করা। কখনো পরোক্ষভাবে আবার কখনো প্রত্যক্ষভাবে সেসব অশ্লীলতা প্রচারে রত থাকা।

গ. স্কুল-ভার্সিটি, সামাজিক সংগঠন ও সংস্থাসমূহে পর্দা নিষিদ্ধ করা এবং অবাধ মেলামেশা ও অশ্লীলতাকে চাপিয়ে দেওয়া।

৬. বিভিন্নভাবে ইসলামী দাওয়াত বাধাগ্রস্ত করা, যেমন:

ক. ইসলামী বই-পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারণায় বিধি-নিষেধ আরোপ করা, পক্ষান্তরে যেসব বই-পুস্তকের কারণে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করবে, ইসলামী ঈমান-আকিদা বিনষ্ট হবে ও শরীয়তের ব্যাপারে সন্দেহ তৈরি হবে, সেগুলো অধিকহারে প্রকাশ ও বিতরণ করা।

খ. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতাবলম্বী লোকদের বিভিন্ন মিডিয়ায় সুযোগ দেওয়া, যেন তারা দেশের অধিকাংশ মানুষের সামনে তাদের পথভ্রষ্টতা প্রচার করার সুযোগ পায় ও শরীয়তকে বিকৃত করতে সক্ষম হয়; পক্ষান্তরে যেসব আলেম মানুষের সামনে দ্বীনের হাকিকত তুলে ধরবেন তাদেরকে মিডিয়ায় নিষিদ্ধ করা হয়, অথবা ইসলামিক মিডিয়াগুলো বন্ধ করা হয়।

৭. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, আল্লাহর পথে আহ্বানকারী দা'ঈদের হয়রানী করে বেড়ানো, তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা, তাদের উপর বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করা এবং তাদেরকে বিভিন্ন খারাপ বিশেষণে বিশেষায়িত করা; সমাজে প্রচার করা যে, তারা রক্ষণশীল, বিবেক প্রতিবন্ধী ও পশ্চাতমুখী; আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে বৈরিতা পোষণকারী, চরমপন্থি ও উগ্রবাদী, বাস্তবতা বুঝে না, তারা মূল বস্তু ত্যাগ করে খোসা ধরে রাখে ইত্যাদি।

৮. এ মতবাদের অনুসারীদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, যেসব মুসলিম সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে আপোষ করে না তাদেরকে নিঃশেষ করে দেওয়া, তাদেরকে দেশান্তর করে দেওয়া, অথবা জেলে দেওয়া অথবা হত্যা করা।

৯. এ মতবাদের অনুসারীদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের আবশ্যকতা অস্বীকার করা, জিহাদ নিষিদ্ধ করা এবং জিহাদকে একপ্রকার ডাকাতি ও বর্বরতা জ্ঞান করা।

কারণ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের অর্থ আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করা, যেন পৃথিবীর বুকে ইসলামী হুকুমত ব্যতীত দাপুটে ও শক্তিধর কোনো হুকুমত না থাকে; পক্ষান্তরে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার সকল শাখা থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করা। ধর্ম সম্পর্কে তাদের সবচেয়ে সুন্দর উক্তি হচ্ছে: "মানুষ ও তার উপাস্যের মাঝে ধর্ম বিশেষ এক বন্ধন, যার প্রভাব ইবাদতগৃহের বাইরে ব্যক্তির কথা, কাজ ও চরিত্রে প্রতিফলিত হবে না"। অতএব আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্যে জিহাদের অনুমতি তাদের দৃষ্টিতে না-থাকাই স্বাভাবিক।

ধর্মনিরপেক্ষ ও তার অনুসারীদের নিকট সম্পদ ও ভূ-খণ্ড রক্ষা ব্যতীত যুদ্ধ করা বৈধ নয়; দ্বীনের সুরক্ষা, দ্বীন প্রচার ও তার বিজয়ের জন্য জিহাদ করা তাদের নিকট বর্বরতা ও সীমালঙ্ঘনের শামিল, যা সভ্য প্রগতিশীল মানুষের নিকট গ্রাহ্য নয়!!

১০. তারা জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের দাওয়াত দেয়, তার ভিত্তিতে তারা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার স্বপ্ন দেখে। তাদের নিকট একতার মানদণ্ড হচ্ছে জাতীয়তাবাদ, অথবা ভাষা, অথবা ভূ-খণ্ড অথবা পার্থিব কোনো স্বার্থ; ধর্মের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হওয়া তাদের সংবিধানে বৈধ নয়, বরং দ্বীন তাদের দৃষ্টিতে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টির বড় কারণ। তাদের কেউ এমনও বলেছে: "রক্তাক্ত শতাব্দীগুলোর অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, পরকালীন জীবনের নিরাপত্তার জিম্মাদার কথিত ধর্ম বা দ্বীন শান্তিকে ধ্বংস করেছে"।আমরা এখানে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীদের জন্ম দেওয়া মুসলিম দেশে বিদ্যমান কয়েকটি কুফল উল্লেখ করলাম, বস্তুত তার কুফল আরো অধিক, আরো ব্যাপক।কেউ দৃষ্টি দিলে এ সকল কুফল অথবা তার বেশিরভাগ কুফল অধিকাংশ মুসলিম দেশে অনুভব করবে বা স্বচক্ষে দেখবে। আরো দেখবে যে, মুসলিম দেশের গভীর পর্যন্ত এ সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা স্বীয় শিকড় শক্তিশালী করেছে।একজন মুসলিম তার ডানে-বামে মুসলিম অধ্যুষিত যে কোনো দেশের দিকে তাকালে খুব সহজে, বিনা কষ্টে ও অনায়াসে সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার এক বা একাধিক কুফল দেখতে পাবে, বরং তার বিবিধ কুফল থেকে মুক্ত কোনো দেশ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

ইসলামি শরীয়াহ

'শরী'য়াহ্' একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ দ্বীন, জীবন-পদ্ধতি, ধর্ম, জীবন আচার, নিয়ম- নীতি ইত্যাদি। তবে আরবী ভাষায় শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল- পানির উৎসস্থল বা যে স্থান থেকে পানি উৎসারিত হয়ে গড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ সেখানে এসে পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করে।

শরী'য়াহ্ হলো জীবন বিধান। কুরআনে এসেছে।

"তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরী'য়াহ ও জীবন-পদ্ধতি নির্ধারণ করেছি।" [সূরা আল-মায়িদাহ: ৪৮]

শরী'য়াহর পারিভাষিক অর্থ:

"মহান আল্লাহ তা'আলা বান্দার জীবন ও জগত পরিচালনার জন্য যে আক্বিদা, ইবাদত, আখলাক, লেনদেন ও জীবন ব্যবস্থা প্রদান করেছেন, যা তাদের ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি বাস্তবায়ন করে তা-ই হল ইসলামী শরীয়াহ্"।'

সকল সৃষ্টির 'স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জীবন চলার জন্য মানুষকে কুরআনুল কারীমে যে বিধিবিধানগুলো দিয়েছেন, আল্লাহর সর্বশেষ নবী রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসের মাধ্যমে যে হুকুম-আহকামগুলো জারী করে গেছেন এবং এ দু' শাস্ত্র থেকে প্রাপ্ত নীতিমালাগুলোর ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কেরাম কর্তৃক যেসব শাখাগত বিধানাবলী প্রস্তুত হয়েছে সেগুলোর নামই শরীয়াহ।

এ আইনের মাধ্যমেই পৃথিবীর বৃহৎ অঞ্চল হাজার বছরের অধিক কাল ইনসাফের সাথে শাসিত হয়েছে। গণমানুষ ভোগ করেছে ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিরাপত্তা, পেয়েছে ন্যায়বিচার, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও ঈমান নিয়ে জীবন যাপনের নিশ্চয়তা। যেখানে বিচারকেরা নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে শরীয়াভিত্তিতে রায় দিয়ে গেছেন। কোনো খলিফা- বাদশার তাতে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ ছিল না। আইনের চোখে সবাই সমান, ধনী-গরীব ও শাসক- শাসিত নির্বিশেষে সকলের জন্য

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾]النساء :٣٦[

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে কিছু শরীক করো না ও পিতামাতার সাথে সদাচরণ করো"। [সূরা আন-নিসা: ৩৬]

ইসলামী শরীয়াহর উৎসসমূহ

১।কুরআন:ইসলামী শরী'য়াহ এর সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে আল-কুরআনুল কারীম। এটি ক্রিয়ার মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ: জমা করা, একত্র করা। অতঃএব, القراءة অর্থ: উচ্চারণে এক হরফকে আরেক হরফের সাথে মিলানো। আল-কুরআনকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ কিতাব নামে খাস করা হয়েছে। ফলে কুরআনকে কিতাব বলা হয়। কতিপয় উলামা বলেছেন, আল্লাহর কিতাবসমূহের মধ্যে এ কিতাবকে কুরআন বলার কারণ হলো এটা অন্যান্য সব কিতাবের সারাংশ, বরং সব ইলমের সারমর্ম এতে একত্রিত হয়েছে।

আল-কুরআন হলো আল্লাহর কালাম যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে এবং আমাদের কাছে মুতাওয়াতির তথা অসংখ্য ধারাবাহিক বর্ণনার মাধ্যমে পৌঁছেছে,যাতে আমরা এর তিলাওয়াত ও আহকাম পরিপালনের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করি, আর যাতে এটি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের সত্যতার দলিল হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ
﴾ [الشعراء :١٩٢، ١٩٥]
"আর নিশ্চয় এ কুরআন সৃষ্টিকুলের রবেরই নাযিলকৃত। বিশ্বস্ত আত্মা এটা নিয়ে অবতরণ করেছে। তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।" [সূরা আশ-শু'আরা: **১৯২-১৯৫**]

২।সুন্নাহ:সুন্নাহ এর শাব্দিক অর্থ পথ, পদ্ধতি ও জীবন চরিত; চাই তা প্রশংসনীয় হোক বা নিন্দনীয়। এ শব্দটির ব্যবহার আল-কুরআনে ও হাদীসে এ অর্থে এসেছে। যেমন: আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

(سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا
"তাদের নিয়ম অনুসারে যাদেরকে আমি আমার রাসূলদের মধ্যে তোমার পূর্বে পাঠিয়েছিলাম এবং তুমি আমার নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবে না”। [সূরা আল-ইসরা: ৭৭]
যে সব বিধান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ওয়াজিব হওয়া ছাড়াই সাব্যস্ত হয়েছে। এটি শরী'য়াহর পাঁচ প্রকার বিধানের একটি। সেগুলো হলো: ফরয, হারাম, সুন্নাত, মাকরূহ ও মুস্তাহাব।

উসূলবিদদের মতে সুন্নাহ হলো:
কুরআন ব্যতীত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও মৌন সমর্থনকে সুন্নাহ বলে।মুসলমানগণ এ ব্যাপারে একমত যে, শরী'য়াহর বিধান বা রাষ্ট্র পরিচালনা ও বিচার কার্যে যা কিছু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশ পেয়েছে, চাই তা তাঁর কথা বা কাজ বা মৌন সমর্থন যাই হোক এবং তা আমাদের পর্যন্ত সহীহ সনদেবর্ণিত হয়েছে, সেগুলো মুসলমানদের জন্য দলিল ও শরী'য়াহর মূলভিত্তি হিসেবে ধর্তব্য হবে। মুজতাহিদগণ এ থেকে শর'ঈ বিধি- বিধান ও বান্দাহর আদেশ নিষেধ উদ্ভাবন করবেন।

৩.ইজমা:

ইজমা' হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর মুসলিম উম্মাহর মুজতাহিদগণ কোনো এক যুগে শরী'য়াহ এ কোনো এক বিধানের উপর একমত হওয়া। মুসলমানগণ একমত যে, ইজমা' শরী'য়াহ এর দলিল, প্রত্যেক মুসলিমের উপর এ অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ইজমা দলিল হওয়ার প্রমাণ:
আল-কুরআনে এসেছে:
"কারো নিকট হেদায়াত প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণকরে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব।" [সূরা আন-নিসা: ১১৫]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার উম্মত ভুলের উপর একমত হবে না। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি তিনি যেন আমার উম্মতকে ভ্রষ্টতার উপর কখনো একমত না করেন। ফলে আল্লাহ আমার দো'য়া কবুল করেছেন। তাই যে জান্নাতের স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে চায় সে যেন জামা'আতের সাথে থাকে। আর যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে সামান্য পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে তার ঘাড় থেকে ইসলামের রশিকে ছিন্ন করল (অর্থাৎ ইসলাম থেকে দূরে সরে গেল)"।

৪.কিয়াস:কিয়াস হচ্ছে কোনো বিষয়ের জন্য সে বিধান নির্ধারণ করা, খে বিধান স্পষ্টভাবে অন্য একটি বিষয়ের জন্য কুরআন বা হাদীসে বর্ণনা করা আছে, উভয় বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানকারী 'ইল্লাত' বা হেতু থাকার কারণে। অধিকাংশ ফিকহবিদগণ একমত যে, কিয়াস শরীয়তের দলিল, এর দ্বারা আহকাম সাব্যস্ত করা হয়।

সাহাবা কিরামগণ শরীয়তের কিছু বিধান ইজতিহাদ করে বের করেছেন, অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে ছিলেন। তিনি তাদেরকে তিরস্কার করেননি। এটা ঘটেছিল যখন তিনি তাদেরকে আহযাবের যুদ্ধের দিন আসরের সালাত বনী কুরাইযাতে গিয়ে আদায় করতে নির্দেশ দেন। পথিমধ্যে আসরের ওয়াক্ত হলে তাদের কিছু সংখ্যক ইজতিহাদ করে পথেই সালাত আদায় করেন। তারা বললেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে সালাত বিলম্বে আদায় করা চাননি, বরং তিনি চেয়েছেন আমরা যেন দ্রুত বনী কুরাইযাতে যাই"।ফলে তারা রাসূলের আদেশের অর্থের দিকে লক্ষ্য করেছেন। অন্য দল শব্দের দিকে তাকিয়ে ইজতিহাদ করে আসরের সালাত বনী কুরাইযাতে গিয়ে বিলম্বে আদায় করেন।

যেসব ব্যাপারে স্পষ্ট নস পাওয়া যায় না সে ক্ষেত্রে কিয়াস হলো উক্ত মাস'আলার হুকুম উদঘাটনে প্রথম পদ্ধতি বা উপায়। এটা ইসতিম্বাতের ক্ষেত্রে খুবই স্পষ্ট ও শক্তিশালী পন্থা।

কিয়াস চারটি আরকানের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে

১- আসল বা মূল মাস'আলা, যার হুকুমের ব্যাপারে নস এসেছে।

২- ফর'আ তথা শাখা মাস'আলা, যার হুকুম মূল মাস'আলার উপর কিয়াস করে দেয়া হবে।

৩- আল-ইল্লাহ তথা কারণ, যে কারণের উপর ভিত্তি করে মূল মাস'আলার হুকুম এসেছে এবং এটা শাখা মাস'আলার মাঝেও পাওয়া যাবে।

৪- মূল মাস'আলার হুকুম। অতঃপর যদি উপরিউক্ত সব শর্ত সঠিকভাবে সর্বসম্মতভাবে পাওয়া যায় তবে তা সহীহ কিয়াস হবে, নতুবা কিয়াসটি ফাসিদ বলে গণ্য হবে।

ইসলামী শরীয়াহর বৈশিষ্ট্য

১.আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান:

ইসলামী শরীয়াহর মূল বৈশিষ্ট্য হলো এটি আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান যা মহান আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল কৃত। এতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর তরফ থেকে। চাই সংক্ষিপ্ত নস হোক বিস্তারিত বিবরণ, সরাসরি নসের থেকে মাস'আলা উদ্ভাবন হোক বা নসের উপর কিয়াস করে মাস'আলা উদ্ভাবন। ইজতিহাদ ও কিয়াসের পদ্ধতিসমূহ কুরআন ও সুন্নাহর নসের উপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে, এমনিভাবে ফুকাহায়ে কিরামদের মতামতও কুরআন সুন্নাহ এর উপর ভিত্তি করেই করে থাকেন।।

২.ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ ও স্বার্থ বাস্তবায়ন করে:

ইসলামী শরীয়াহ ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ ও স্বার্থ বাস্তবায়ন করে। কেননা ইসলামী শরীয়াহ যেহেতু মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিল কৃত, যিনি সব কিছুই জ্ঞাত, তিনি সর্বকালে ও স্থানে ব্যক্তির অন্তরের গোপনীয়তা ও সৃষ্টির স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। তিনি তাদের অতীত ও বর্তমান সব কিছুই জানেন।

সেহেতু এটি মানব জাতির শান্তি বাস্তবায়ন করে যখন তারা এ অনুযায়ী জীবন যাপন করবে। কেননা এটা মানব জীবন পরিচালনার সব নিয়ম কানুন অন্তর্ভুক্ত করেছে। তাদের শান্তি কল্যাণ বাস্তবায়ন করে, এমনকি তাদের জন্মের পূর্বেও তাদে কল্যাণের প্রতি খেয়াল রাখে। যেমন, পিতাকে বিয়ের আগে উত্তম মা নির্বাচন করতে নির্দেশ দিয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"পিতার উপর সন্তানের অধিকার হলো তিনি তার জন্মের উত্তম স্থান (উত্তম মা) নির্ধারণ করবেন এবং জন্মের পরে তার ভাল নাম রাখবে ও আদব শিক্ষা দিবে"।

অন্যদিকে ইসলামী শরী'য়াহ সন্তানের উপর পিতার আনুগত্য ও তাদের প্রতি ইহসানের মাধ্যমে তাদের অধিকার নিশ্চিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾]النساء: ٣٦[

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে কিছু শরীক করো না ও পিতামাতার সাথে সদাচরণ করো"। [সূরা আন-নিসা: ৩৬]

৩.ইসলামী শরী'য়াহ বিশ্বব্যাপী ও সার্বজনীন

ইসলামী শরী'য়াহ কোনো নির্দিষ্ট স্থানের জন্য আসেনি যে সেখানকার রাষ্ট্র শুধু উক্ত ভূখণ্ডে তা বাস্তবায়ন করবে,কোনো মিশনের সাথেও নির্ভরশীল নয় যে মিশনটি শেষ হলে এটিও শেষ হয়ে যাবে। জমিনে যে স্থানে ও যে কালেই মানুষ পাওয়া যাবে ইসলামী শরী'য়াহ তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, আক্বায়ীদ ও আইন কানুন ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ বৈশিষ্ট্য শুধু মাত্র ইসলাম শরী'য়াহ এর জন্যই খাস, কেননা এটা সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা মহা.. আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে।

৪.ইসলামী শরী'য়াহ এর বিধানসমূহ আক্বীদার সাথে সম্পৃক্ত

ইসলামী শরীয়াহর বিধানগুলো অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, এর কতিপয় বিধান অর্থনীতি, কিছু সামাজিক, কিছু আখলাকী, কিছু লেনদেন যেমন, বেচাকেনা ও ভাড়া এবং কিছু অপরাধ ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত। নানা ধরনের এ বিধানগুলোর সব কিছুই আক্বীদার সাথে গভীরভাবে সম্পর্ক রয়েছে। যেমন, যাকাত ইসলামের একটি রোকন, এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,
"অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে, যারা নিজদের সালাতে বিনয়াবনত। আর যারা অনর্থক কথাকর্ম থেকে বিমুখ। আর যারা যাকাতের ক্ষেত্রে সক্রিয়"। [সূরা আল-মু'মিনূন: ১-৪]

এছাড়াও অন্যান্য আহকামের ক্ষেত্রেও একই কথা। যেমন, সুদের ব্যাপারে আমরা দেখি এর সাথে ইসলামী আক্বীদার এক সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়েছে, লেনদেনের ক্ষেত্রে সুদকে হারাম করেছে আক্বীদার সাথে এর রয়েছে গভীর সম্পর্ক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قال :ومن غش فليس منا

"যে ধোঁকাবাজি করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়"।

চুরির শাস্তির আখলাকী ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি, এর সাথেও রয়েছে আক্বীদার সম্পর্ক। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾]المائدة :٣٨[

"আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের অর্জনের প্রতিদান ও আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় আযাবস্বরূপ"। [সূরা আল-মায়েদা: ৩৮]
এভাবেই ইসলামী শরী'য়াহর আহকামগুলো মানুষের অন্তরের গভীরে শক্তি, কর্ম-প্রেরণা যোগায়।

৫.ইসলামী শরী'য়াহ মানুষের অন্তরকে লালন পালন করে

ইসলাম মুসলমানের অন্তরে আল্লাহর ভয়-ভীতি বীজ বপন করে, যা মুসলিমকে বলপ্রয়োগ বা জোর ছাড়াই আল্লাহর বিধানসমূহ সন্তুষ্টচিত্তে ও নিজের পছন্দে মানতে সাহায্য করে। কেননা

সে একথা উপলব্ধি করে যে, ইসলামী আইন মানা হচ্ছে দ্বীন ও আল্লাহর আনুগত্য পোষণ, পক্ষান্তরে মানব রচিত আইন মানতে মানুষ জালিয়াতি ও ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়। তারা মনে করে যে, এ আইন মেনে চলা কোনো আনুগত্য করা নয় এবং এর থেকে ভেগে যাওয়া কোনো দোষ নয়।।ইসলামী শরীয়াহ মানুষের অন্তর গঠন ও একে পরিশোধন করতে অতুলনীয় ভাবে সফল হয়েছে।

এটা আমরা দেখতে পাই মা'য়েয রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর ঘটনায়, যখন তিনি যিনায় পতিত হলে তার অন্তর তাকে আল্লাহর ভয় সম্পর্কে সতর্ক করে। ফলে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন, তিনি তাঁর কাছে তাকে পরিশুদ্ধ করতে বললেন। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রজমের নির্দেশ দেন এবং তাকে রজম দেয়া হয়। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,"তোমরা মা'য়েয ইবন মালিকের জন্য ইসতিগফার করো, তারা বললেন, আল্লাহ মা'য়েয ইবন মালিককে ক্ষমা করে দিন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে এম তওবা করেছে যে, যদি আমি তা আমার উম্মতের মধ্যে বণ্টন করি তবে তা যথেষ্ট হবে"।ইসলামী শরী'য়াহয় এ ধরণের জীবন্ত অনুভূতি ইসলাম তার অনুসারীদেরকে শিক্ষা দিয়েছে, যা অন্যান্য আইনের চেয়ে অনেক শক্তিশালী, আসমানী শরী'য়াহ যেমন মানুষের অন্তরে প্রভাব মানব রচিত আইনে এরূপ কোনো প্রভাব নেই।ইসলাম থেকে বিচ্যুত সমাজে যা কিছু ঘটছে এবং তাদের আইন কানুন সমাজে নিরাপত্তা, শান্তি, স্থিতিশীলতা ও অপরাধ দমনে ব্যর্থতাই প্রমাণ করে ইসলামী শরী'য়াহ বাস্তবায়ন কতোটা প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা যথার্থই বলেছেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾]المائدة: ٥٠[

"আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম? [সূরা আল-মায়েদা: ৫০]

৬ ইসলামী শরী'য়াহ সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত

মানব রচিত আইন মানুষের মাঝে সমতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয় না। ফলে রাষ্ট্রে প্রধান বা প্রধান মন্ত্রীকে জাতির অন্যান্য লোকদের উপর উচ্চ মর্যাদা দিয়ে থাকে। সংবিধানে রাষ্ট্রের প্রধানকে তার কৃত অপরাধের জবাবদিহিতা কাউকে দিতে হয় না।সফরসঙ্গীদের কৃত অপরাধের শাস্তি ক্ষমা করে দেয়। সাবেক দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক এ ভেদাভেদ খুব করতেন। বিশাল কৃশাঙ্গ জনগোষ্ঠীর মাঝে শ্বেতাঙ্গরাই বহু বছর শাসন করেছিলেন।পক্ষান্তরে, ইসলামী শরী'য়াহ চৌদ্দ শত বছর পূর্ব থেকেই সমতা বিচারে মানব রচিত অন্যান্য সব আইনের থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। ইসলামী শরীয়াহর দৃষ্টিতে দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের ক্ষেত্রে সকলেই সমান। শাসক ও জনগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

* فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ *وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

"অতএব, কেউ অণু পরিমাণ ভালকাজ করলে তা সে দেখবে, আর কেউ অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করলে তাও সে দেখবে"।[সূরা আয-যিলযাল: ৭-৮]

ইসলামে উঁচু-নিচু ও শক্তিশালী-দুর্বল সকলের মাঝেই সমানভাবে শাস্তির বিধান বাস্তবায়ন করা হয়। এর চমৎকার উদাহরণ হলো আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত হাদীস

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, আল-মাখযুমী সম্প্রদায়ের জনৈকা মহিলার ব্যাপারে কুরাইশ বংশের লোকদের খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল যে কিনা চুরি করেছিল। সাহাবা কিরামগণ বললেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কে কথা বলতে পারবে? আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় পাত্র উসামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ছাড়া কেউ এ সাহস পাবেন না। তখন উসামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বললেন: এতে তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ তা'য়াআলার দেওয়া শাস্তির বিধানের ক্ষেত্রে সুপারিশ করছ? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করলেন এবং বললেন, হে মানব মণ্ডলী! নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের লোকেরা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। কেননা কোনো সম্মানিত লোক যখন চুরি করত তখন তারা তাকে রেহাই দিয়ে দিত। আর যখ কোনো দুর্বল লোক চুরি করত তখন তার উপর শরী'য়তের শাস্তি প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ এর কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে অবশ্যই মুহাম্মদ তার হাত কেটে দেবে"।(বুখারী:৬৭৭৮)

সেক্যুলারিজম না শরীয়াহ উত্তম?:

সেক্যুলার ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত নেয়ার মাপকাঠি হলো তাদের খেয়ালখুশি ও কামনা- বাসনা, যেগুলোকে তারা নিজেদের ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে।সেক্যুলারিজম উসকে দেয় মানুষের নফস ও কুপ্রবৃত্তিকে। নৈতিকতার এ ভুল মাপকাঠির কারণেই আধুনিকতা ও অর্থনৈতিক উন্নতির শিখরে থাকার পরও আজ পশ্চিমা সেক্যুলার সমাজগুলো থামাতে পারছে সমাজের অবক্ষয় আর ভাঙনের নীল স্রোত, পতনকালের অঙ্কুরিত অগ্ন্যুৎসব। মূল্যবোধের অবক্ষয়, পরিবারের ভাঙন, ধর্ষণ, মাদকাসক্তি, অবাধ ও বিকৃত যৌনতা, অশ্লীলতা, পর্নোগ্রাফি, যৌনায়িত ম্যাস মিডিয়া, সমকামিতা, উভকামিতা, পশুকামিতা, শিশুকামিতা, নারী- পুরুষের সংজ্ঞাকে ঝাপসা করে দেয়া ট্র্যান্সজেন্ডার উন্মাদনা, বিনোদনে বুঁদ হয়ে থাকা থাকা সমাজ, নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য, ভোগবাদ আর অবিশ্বাসে নিমজ্জিত তারুণ্য-সভ্যতার বাঁধন ছিঁড়ে পড়ছে চারদিক থেকে। বাঁধভাঙা গতিতে আধুনিক সভ্যতা ছুটে চলছে ধ্বংসপাহাড়ের কিনারায়, এক অনতিক্রম্য অন্তহীন অন্ধকারের দিকে-আদ, সামুদ, কওমে ভূতসহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া নাম না জানা আরও অনেকে জনপদের মতো। মানুষিক খেয়ালখুশিকে দেবতার আসনে বসানো সেক্যুলারিজম এবং ভোগবাদের নেশাতুর নির্লিপ্ত কাচ-চোখে চেয়ে থাকা সেক্যুলার মানুষ এ পতন থামাতে ব্যার্থ।

একমাত্র ইসলামী শরীয়াহতেই মানুষের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান আছে।মানবরচিত কোনো মতবাদ ইনসাফপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। তাই ইসলামিক শরীয়াই উত্তম।

ইসলামী শরীয়াহ কেন উত্তম:

ইসলামী শরীয়াহর সৌন্দর্য হলো শরীয়াহ মানুষের ফিতরাহ বা সহজাত প্রবণতার (Natural Disposition) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর খেয়ালখুশিকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা সেক্যুলার ব্যবস্থা ফিতরাহর সাথে সাংঘর্ষিক।প্রাণী হিসেবে মানুষ একই সাথে ধারণ করে অত্যন্ত মহৎ এবং অত্যন্ত পাশবিক আচরণের সক্ষমতা ও প্রবণতা। মানুষের পক্ষে সম্ভব না নিষ্পাপ হওয়া। সম্ভব না নিজের কুপ্রবৃত্তি, কুচিন্তাকে সম্পূর্ণভাবে ঝেড়ে ফেলা। মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তির ভেতর উপযুক্ত মানসিক অবস্থা এবং তার চারপাশে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ প্রথমে ব্যক্তির মধ্যে এমন উপলব্ধি তৈরি করা যার কারণে ব্যক্তি নিজের ভেতর অনুভব করবে নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে দূরে থাকার, সেগুলোকে ঘৃণা ও বর্জন করার আকাঙ্ক্ষা। পাশাপাশি এমন একটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে যেখানে চাইলেও সীমালঙ্ঘন করা মানুষের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। হাতের নাগালে যিনা, অশ্লীলতা, নেশা, জালিয়াতি, বাটপারির সুযোগ রেখে তারপর মানুষ নিজে নিজে ভালো থাকবে, এই আশা করে লাভ নেই।

এ কাজগুলোতে জড়িয়ে যাবার পর ফিরে আসতে চেয়েও নিজের দুর্বলতার কারণে যে বারবার ব্যর্থ হয়, শরীয়াহ তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়। নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর প্রতি দুর্বলতা অনুভব করা ব্যক্তি যেন পা পিছলে এই খাদগুলোতে পড়ে না যায় সেটা নিশ্চিত করার জন্য শরীয়াহ তৈরি করে দেয় প্রয়োজনীয় সেইফটি লকগুলো। সবশেষে সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে শরীয়াহ জবাবদিহির ব্যবস্থা করে। নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য ব্যবস্থা করে নির্দিষ্ট শাস্তির। আর এ শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে গাফলতি, স্বজনপ্রীতি বা অযৌক্তিক শিথিলতার সুযোগ দেয় না।এভাবে মানবজাতির আত্মিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থা ও সমাধান দেয় শরীয়াহ। শরীয়াহ মানুষের জন্য এমন একটি বাহ্যিক পরিবেশ অভ্যন্তরীণ নৈতিকতার মানদণ্ড ঠিক করে দেয়, যা নিয়ন্ত্রণে রাখে মানুষের নফস এবং কুপ্রবৃত্তিকে।